আসরারে খুদী

ডক্টর মুহম্মদ ইকবাল

সৈয়দ আবদুল মান্নান অনূদিত

আসরারে খুদী

ডক্টর মুহম্মদ ইকবাল

সৈয়দ আবদুল মান্নান অনূদিত

আল্লামা ইকবাল সংসদ

আসরারে খুদী
ডক্টর মুহম্মদ ইকবাল
সৈয়দ আবদুল মান্নান অনূদিত

প্রকাশনা কমিটি
এডভোকেট মুজীবুর রহমান (চেয়ারম্যান)
ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
মীর কাসেম আলী
সৈয়দ তোসারফ আলী
ড. আবদুল ওয়াহিদ (সম্পাদক)

প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫০
তৃতীয় সংস্করণ ২০০২

প্রচ্ছদ
সবুজ
কোবা এ্যাডভারটাইজিং এন্ড প্রিন্টার্স

প্রকাশনায়
আল্লামা ইকবাল সংসদ
৩৮০/বি মিরপুর রোড (৩য় তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা। ফোন ঃ ৮১২৫১৮৮

মুদ্রণ
কোবা এ্যাডভারটাইজিং এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২ চাষীকল্যাণ ভবন, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৯৩৩৫৯২৫

মূল্য : ৯০/= মাত্র

Asrar-e-Khudi Bengali version of *Asrar-e-Khudi.* Written by Dr. Muhammad Iqbal and published by Dr. Abdul Wahid, Secretary Genarel, Allama Iqbal Sangsad, 380/B Mirpur Road (2nd Floor) Dhanmondi, Dhaka. Bangladesh. Phone ঃ 8125188
February 2003
Price : Taka 90.00, U S $ 5.00

আমাদের কথা

আধুনিক যুগে মহাকবি ইকবালকে ইসলামী দর্শনের প্রথম সার্থক ব্যাখ্যাতা বলে অভিহিত করা হয়। আল্লামা ইকবালের প্রধান পরিচয় কবি না দার্শনিক হিসেবে, এ নিয়ে সহজেই প্রশ্ন তোলা যায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হওয়ায় কবি হিসেবে তাঁর পরিচিতি যতটা ব্যাপক, দার্শনিক হিসেবে ততটা নয়। মূলত তিনি ছিলেন দার্শনিক এবং তাঁর কবিতায়ও দর্শন-চিন্তার ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

ইকবালের জগদ্বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *আসরারে খুদী* ১৯১৫ সালে লাহোরে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। গ্রন্থটি প্রথম অনূদিত হয় ইংরেজী ভাষায়। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সির অধ্যাপক ড. আর এ নিকলসন বই খানা অনুবাদ করেন। বাংলায় সৈয়দ আবদুল মান্নান চল্লিশের দশকে বই খানা অনুবাদ করেন। এরপর গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত ও হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে আসরারে খুদীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

গ্রন্থটি দীর্ঘদিন যাবৎ বাজারে না থাকায় ইকবাল ভক্ত এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকবৃন্দ আমাদেরকে গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ জানাতে থাকেন। পূর্ববর্তী অনুবাদটিই আমরা পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে পারায় শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

গ্রন্থটি ইকবাল ভক্তদের পিপাসা নিবারণে সহায়ক হবে। নিঃসন্দেহে গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে অনন্য সংযোজন।

আসরারে খুদী

ঋণ স্বীকার

পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক-কবি মোহাম্মদ ইকবাল। শতাব্দির তন্দ্রাবিবস জাতির কর্ণে তিনি এনেছিলেন আজাদীর আহবান। সুপ্তোত্থিত জাতি এক নব-জাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সমবেতভাবে অগ্রসর হলো আজাদীর পথে- তরক্কীর পথে। জীবন-পণ সংগ্রামের পথে তারা পেলো জাতির পিতা কায়েদে আজমের পথ-নির্দেশ। তাই ইকবালের স্বপ্নের পাকিস্তান বাস্তবে রূপায়িত হলো কায়েদে আজমের অধিনায়কত্বে চালিত জীবন-পণ সংগ্রামে।

মহাকবি ইকবালের বাণী পাকিস্তানের জীবন দর্শন। তাই ইকবালের সাহিত্য, তাঁর দর্শন ও চিন্তাধারা জাতির প্রত্যেকটি মানুষের কানে পৌছে দেবার প্রয়োজন আছে। এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে করাচীতে ইকবাল **একাডেমী কেন্দ্রীয়** পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা দফতরের পৃষ্ঠপোষকতায়।

'আসরারে খূদী'র একমাত্র বাংলা অনুবাদের স্বীকৃতি স্বরূপ **ইকবাল একাডেমী** আমায় দু'হাজার টাকা অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করেছেন এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য। এর ফলে ইকবাল-সাহিত্যের আলোচনা ও অনুবাদে বাঙালী যুবকরা আরো বেশী উৎসাহিত হবেন, সন্দেহ নেই। তাই ইকবাল একাডেমীর কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক শুকরিয়া।

সৈয়দ আবদুল মান্নান

আব্বা ও আম্মার খেদমতে—

তোমাদের স্নেহধারা চিরনিশিদিন
নামিয়াছে অবারিত অশ্রান্ত ধারায়
জীবনের প্রতি পদক্ষেপে;
বুকের শোণিত দিয়া আশৈশব করেছো পালন,
না চাহি' নিজের সুখ নিত্য দিবারাতি
কামনা করেছো মোর উন্নত জীবন,
অন্তরের স্নেহালোকে নাশি' দুঃখ-ভীতি
বারে বারে দেখায়েছো পথ
দুর্গমের পথ-যাত্রী মোরে,
অনন্ত প্রাণের ঋণে ঋণী মোর প্রতি রক্ত-কণা।

মুসা কলিমের মতো অন্তরের সিনাই পাহাড়ে
অনন্ত আলোক হেরি' প্রাচ্য-কবি-শ্রেষ্ঠ ইকবাল
আনিল সত্যের জ্যোতি অনির্বাণ, অম্লান, সুন্দর।
তারই এক কণা
লু'টে নিয়ে কালের ভাণ্ডা হোতে
তুলে দিনু তোমাদের করে।
নহে ইহা ঋণ-পরিশোধ;
দীনের এ তোহ্‌ফা শুধু
তোমাদের সে অনন্ত ঋণের স্বীকৃতি।

موج زخود رفتهٔ تیز خرامید و گفت
هستم اگر میروم گر نروم نیستم
اقبال

দুর্বার তরংগ এক বয়ে গেলো তীর তীব্র বেগে,
ব'লে গেলো ঃ আমি আছি, যে মুহূর্তে আমি গতিমান,
যখনি হারাই গতি, সে মুহূর্তে আমি আর নাই।
অনুবাদ ঃ ফররুখ আহমদ

সিনাই পাহাড় জ্ব'ল জ্ব'ল হ'ল খাক
মোর অনাগত নতুন মুসার তরে,
নার্গিসে তার বেদনার জ্বালা ঢেলে
চলে মুসাফির ব্যথাতুর অন্তরে
ওতানিয়াতের চার পাথরের কাটায়ে ক্ষুদ্র সীমা
দেখে সুবিশাল মখলুকাতের বিমুক্ত মাধুরিমা,
কাফেলার পথ মুখরিত আজ শোনে সে বাঙ্গে-দেরা,
ঘুমন্ত নিশি শেষে বেদুঈন আবার ছেড়েছে ডেরা
নতুন আশায় মন তার ছোটে যেন বালে জিব্‌রিল
আসরারে খুদী, রমুজে বেখুদী মাতাল ক'রেছে দিল।

আফ্‌তাব আজ ভুলেছে অপরিচয়
জাগে বিমুগ্ধ মনে আপনারে চিনিবার বিস্ময়-
বর্‌গে গুলের শিখা হলো লালে লাল
পাকিস্তানের স্বর্ণ-ঈগল ভেঙেছে জীর্ণ ডাল...

দূর মদীনার শমীম সবুজ শীষে
এনেছে নূতন গান
স্বপ্ন দেখিছে হেজাজী হাওয়ায় মিশে
সোনালি পাকিস্তান,
স্বপ্ন দেখিছে বোত-শিকনির দিন
জিঞ্জির হীন লাখো অমলিন দিন।
সী-মোরগ এক শোনে আকাশের ডাক
মুর্দার মত বন্দী ওতান 'পরে,
নও বাহারের দিনে এল বৈশাখ
আজাদীর পথে ডেকে গেল হাহাস্বরে*

দেরী শুধু তার জিঞ্জির খোল্‌বার-
দেরী শুধু তার নীল নেশা ভোল্‌বার...
তবু তোলপাড় শোনে সে তারার
উধাও বহ্নি-স্রোতে
দুর্মর বেগে পয়ামের সুর ওঠে কোথা রণরণি-
ফারানের বুকে বহুদুর পর্বতে
নতুন দিনের বিশাল পক্ষধ্বনি।

ফররুখ আহ্‌মদ

পরিচিতি

মুসলিম জাহানের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইকবাল পাকিস্তান রাষ্ট্রোদ্বোধনের উদগাতা বলে সর্বজন-স্বীকৃত। তাঁর বাণীই পাকিস্তানের জীবনদর্শনরূপে গণ্য হবার সব চেয়ে বেশী দাবী রাখে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানেও [সাবেক] তাঁকে উপলব্ধি করবার কোনো প্রত্যক্ষ উপায় নেই; কারণ তাঁর কাব্য উর্দু ও ফারসী ভাষায় রচিত। বাংলায় তাঁকে পেতে হলে কেবল অনুবাদেই পাওয়া যেতে পারে এবং সে কাজ অবিভক্ত বাংলায় সৈয়দ আবদুল মান্নান হাতে নিয়েছিলেন। তিনি ভার নিয়েছিলেন ইকবালের কাব্যবার্তাকে বাংগালীর ঘরে ঘরে পৌছিয়ে দেবার। তারই ফলে তাঁর কৃত 'আসরারে খুদী'র বঙ্গানুবাদ রূপ নিয়েছিল।

ইকবালের ধর্মাশ্রিত আত্মোপলব্ধি স্বভাবতই প্রকাশ পেয়েছে গভীর তত্ত্বকথায়। তত্ত্বকে কাব্যরূপ দেওয়া এবং তাকে রসোত্তীর্ণ করা সহজ কাজ নয়। ইকবালের মূল রচনা পাঠের অধিকারী যাঁরা, তাঁরা তাঁর কাব্যরস উপভোগ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অনুবাদকের কাজ এদিক দিয়ে আরও কঠিন; কারণ তাঁর তো মূল রচনার বক্তব্য কোনোভাবে ক্ষুণ্ন করা চলবেই না, তার উপর কাব্য-ভঙ্গী ও যতটা সম্ভব বজায় রাখতে হবে। ইকবাল নিজেই বলেছেন :

কাব্য সৃষ্টি নয় এ মসনভীর লক্ষ্য
এর লক্ষ্য নয় সৌন্দর্য-পূজা
আর প্রেম-সৃষ্টি

ওগো পাঠক,
দোষ দিওনা আমার সুরাপাত্র দেখে
গ্রহণ করো অন্তর দিয়ে
এই সুরার স্বাদ।

ইকবালের মূল রচনার রূপ গদ্য-কবিতা কি-না, বাংগালীর তা' প্রত্যক্ষভাবে জানা নেই; কিন্তু এর অনুবাদ শুধু গদ্য-কবিতার রূপই নিতে পারে। সৈয়দ আবদুল মান্নান কর্তৃক অনুবাদিত "আসরারে খুদী"র প্রথম অধ্যায়ের উদ্বোধনে আমরা পাই ঃ

অস্তিত্বের রূপ হোল আত্মার পরিণাম,
সব কিছুই আত্মার রহস্য
যা দেখেছো তুমি,
জাগ্রত হোল যখন আত্মা চৈতন্যে
প্রকাশ করলে সে

চিন্তার বিশ্ব।
নির্যাসে তার শত বিশ্ব লুক্কায়িত ঃ
আত্ম-অনুভূতি আনয়ন করে বে-খুদীকে
প্রকাশ-আলোকে।

আর সে অধ্যায়ের শেষে আছে ঃ
জীবন যখন শক্তি সঞ্চয় করে
আত্মা থেকে,
জীবন-তটিনী বিস্তার লাভ করে
সমুদ্রের মহত্বে।

প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে জীবনের মূলরূপে আত্মার পরিচয় বিধৃত। সাবলীল গদ্য-কবিতায় এর যে অনুবাদ সৈয়দ আবদুল মান্নান করেছেন, সংবেদনশীল মনে তাঁর মর্ম গ্রহণ কর্‌তে কোনোই অসুবিধা বোধ হবে না। এমনি করে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে খাঁটি মুসলিম জীবনদর্শন। সৈয়দ আবদুল মান্নানের অনুবাদে তার বলিষ্ঠতা কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে পাঠকের মনে হবে না। একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার : ইকবালের সাধনা ছিল মুসলিম মানসে আত্মার ইসলামানুসারী বিবর্তনকে ফুটিয়ে তোলা, হৃদয়ের পরতে পরতে তিনি তাকে ছন্দায়িত করতে চেয়েছিলেন। জীবনের সব কিছু আত্মার বিকাশের অধীন; "আর্ট ফর আর্টস্ সেক" মতবাদকে তিনি বিনা দ্বিধায় অগ্রাহ্য করেছিলেন :

বিজ্ঞান ও কলার লক্ষ্য নয় জ্ঞান,
বাগিচার লক্ষ্য নয়
কুঁড়ি আর ফুল।
বিজ্ঞান হোল একটি যন্ত্র আত্মসংরক্ষণের,
বিজ্ঞান একটি পন্থা
আত্মাকে শক্তিশালী কর্‌বার
বিজ্ঞান ও কলা জীবনের ভৃত্য,
যে ভৃত্য জন্ম নিয়েছে ও পালিত হয়েছে
তার আপন গৃহে।

সৈয়দ আবদুল মান্নানের অনুবাদ স্বচ্ছ ; তাতে ইকবালের বাণীরূপ কোথাও বিকৃত বা অস্পষ্ট হয়েছে বলে সন্দেহ মনে আসবার অবকাশ পায় না।

প্রেম এলো আত্মাকে শক্তিশালী কর্‌তে : কোনরূপ ভিক্ষা-বৃত্তির স্থান নেই তাতে। নাই যেন প্রেমিকের আত্মবিলোপেরও ঃ ইসলামের বৈশিষ্ট্য এখানে স্পষ্ট। প্রেমের শক্তিতে আত্মা দুনিয়া জয় কর্‌বে ঃ প্লেটোর ভাববাদিতার বিরুদ্ধে ইকবাল জানিয়েছেন সুস্পষ্ট প্রতিবাদ। কাব্য ও সাহিত্যও হবে বাস্তব প্রাণধর্মের অনুসারী। আত্মার বিকাশেরও রয়েছে বাস্তব, হাতে-কলমে পালনীয় তিন দফা কার্যক্রম। তারপর নানা কাহিনীর ভিতর

দিয়ে ইকবালের ধ্যান-ধারণার ইসলামের অন্তর্নিহিত দৃঢ়তা ও নিক্তিতে ওজন করা ন্যায়ান্যায়-বোধ ফুটে উঠেছে। এমনি করে লাখ হয়েছে এ দেশের মুসলিমের অনুসরণীয় জীবনদর্শন। তাকে পূর্ণতায় নেওয়ার সময় আস্‌ছে এই কবির বিশ্বাস ; এবং তারই জন্যে প্রার্থনায় বইখানি সমাপ্ত।

ইসলামের আদর্শে রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিংশ শতাব্দীর দাবী পূর্ণ করতে পাকিস্তান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার সাফল্য সম্বন্ধে অমুসলমান সমাজে সন্দেহও গোপন নেই। তবু তা' করতে হলে সে রাষ্ট্র ও সমাজের বাণীরূপকে সামনে রেখেই তাতে ব্রতী হতে হবে। ব্যক্তিরও অভ্রগঠন হবে তারই অনুসারী। ইকবাল গ'ড়ে তুলেছেন সে বাণীরূপ ; সৈয়দ আবদুল মান্নান বাংগালী মানসে তাকে জাগিয়ে দেবার সাধনায় বিফল হননি। তারপর অপেক্ষা কীসের, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বই খানির একটি কাব্যোপক্রমণিকায় সে কথা ব'লে দিয়েছেন ঃ

দেরী শুধু তার জিঞ্জির খোল্‌বার-
দেরী শুধু তার নীল নেশা ভোল্‌বার...
তবু তোলপাড় শোনে সে তারার
উধাও বহ্নি-স্রোতে
দুর্মর বেগে পয়ামের সুরে ওঠে কোথা রণরণি
ফারাণের বুকে বহুদূর পর্বতে
নতুন দিনের বিশাল পক্ষধ্বনি।

সে দিনই মহাকবি ইকবাল হবেন জয়যুক্ত; সৈয়দ আবদুল মান্নান কৃত অনুবাদের সার্থকতাও সে দিনের অভিমুখে প্রসারিত।

২০/৪, অশ্বিনী দত্ত রোড,
কলিকাতা-২৯

বসুধা চক্রবর্তী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে 'আসরারে খুদী' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো। তারপর এলো দেশব্যাপী রক্তক্ষয়ী দাংগা। চারিদিকের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কিঞ্চিদধিক এক বছরের মধ্যে এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। ইকবাল-দর্শনের প্রতি দেশবাসীর আকর্ষণ অনুবাদকের শ্রম সার্থক করেছে।
তারপর দেশের আজাদী লাভের পর পাকিস্তানের স্পপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক-কবি ইকবালের দর্শন ও সাহিত্যের দিকে দেশবাসীর মনোযোগ আরো বেশী করে আকৃষ্ট হয়েছে। দেশের সাহিত্য-রসিকদের কাছে থেকে দাবী এসেছে এর দ্বিতীয় সংস্করণে বিলম্বের কারণ। ঢাকা তমদ্দুন প্রেসের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর জনাব তৈয়েবুর রহমান এম-এ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার ভার নিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।
ইক্‌বালের 'আসরারে খুদী' কাব্যে প্রকাশিত আত্মদর্শনের পরিচিতি লিখে দিয়ে আমায় গৌরবান্বিত করেছেন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বসুধা চক্রবর্ত্তী। প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা করেছেন শিল্পী-বন্ধু কাজী আবুল কাসেম। কবির চিত্রটি করাচীর শিল্পী আগা হাসানের অংকিত। এঁদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

'তাহজিব' কার্যালায় ঃ
ঢাকা
ডিসেম্বর, ১৯৫০

সৈয়দ আবদুল মান্নান

পূর্ব-কথা

"আস্‌রারে খুদী" ১৯১৫ সালে প্রথম লাহোরে আত্মপ্রকাশ করে। এর অব্যবহিত পরেই ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসীর অধ্যাপক ডাঃ আর এ নিকল্‌সন বই খানা প'ড়ে মুগ্ধ হন ও মহাকবি ইক্‌বালের কাছে এর ইংরেজী অনুবাদের অনুমতি প্রার্থনা ক'রে পত্র লেখেন। তার প্রায় পনেরো বছর আগে ইক্‌বালের সাথে ক্যাম্‌ব্রিজে তাঁর দেখা হয়েছিলো। মহাকবি সানন্দে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ডাঃ নিকল্‌সন কিছুকাল অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকায় অনুবাদ প্রকাশ কর্‌তে কিছুদিন বিলম্ব হয়েছিলো। এই ইংরেজী অনুবাদ ১৯২০ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এর বাংলা অনুবাদে আগাগোড়া ডাঃ নিকল্‌সনের ইংরেজী অনুবাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

ডাঃ ইক্‌বাল পাশ্চাত্য দেশে অবস্থানকালে আধুনিক দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এই বিষয়ে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ্‌-ডি উপাধি লাভ করেন। পারস্যে দর্শন শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তিনি যে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা' সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিলো। ১৯০৮ সালে তা' পুস্তকাকারে বেরিয়েছিলো। এরপর থেকে তিনি একটা নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ গ'ড়ে তোলেন। সে সম্বন্ধে ডাঃ নিল্‌ক্‌সন তাঁর অনুবাদের ভূমিকায় কবির নিজের কথা অনেকখানি উদ্ধৃত ক'রে ইক্‌বালের দার্শনিক মতবাদের সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। "আস্‌রারে খুদী" গ্রন্থে তাঁর কোনো ধারাবাহিক আলোচনা পাওয়া না গেলেও তা'তে তাঁর চিন্তাধারা চিত্তাকর্ষকভাবে বিকাশলাভ করেছে। হিন্দু দার্শনিকেরা যেখানে সত্তার একত্বের মতবাদ প্রচার কর্‌তে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন মস্তিষ্কের দিকে, ইক্‌বাল সেখানে আরো বিপজ্জনক পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি ফার্‌সী কবিদের মতো লক্ষ্য ক'রেছেন অন্তরের দিকে। তিনি কারুর চাইতে ছোট কবি নন্‌, তাঁর কাব্য মানুষের মাঝে একটা অপূর্ব প্রেরণা জাগিয়ে দেয়,– তাঁর বাণী শুধু ভারতীয় মুস্‌লিমের জন্য নয়, বিশ্বমুস্‌লিমের জন্য। তিনি সংগতভাবেই "আস্‌রারে খুদী" হিন্দী অথবা উর্দু ভাষায় না লিখে ফার্‌সী ভাষায় লিখেছেন। কারণ ফার্‌সী শিক্ষিত মুস্‌লিম সমাজে বহু জনসমাদৃত ভাষা। দার্শনিক মতবাদ প্রকাশের জন্যও এ ভাষা অতিসমৃদ্ধ ও আকর্ষণযোগ্য বটে।

ইক্‌বাল অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন একজন প্রেরিত পুরুষের মতো–তাঁর নিজের যুগের কাছে না হোলেও ভবিষ্যতের মানুষের কাছে।

"প্রয়োজন নেই আমার আজ্‌কের মানুষের কর্ণের,
আমি বাণী
অনাগত যুগের কবির।"

আবার :

"আমার সিনাই দগ্ধ হয় সেই মুসার জন্য
যে আসবে ভবিষ্যতে।"

ফার্‌সী কবিদের মতো তিনি সাকীকে আহবান করেছেন তাঁর পিয়ালা পূর্ণ ক'রে দিতে

সুরারসে আর চন্দ্রালোক এনে দিতে তাঁর 'চিন্তার অন্ধকার নিশীথিনীর বুকে'–

"যেনো আমি পারি
ফিরিয়ে আন্‌তে মুসাফিরকে তার গৃহে,-
আলস্য-পরায়ণদের মাঝে আন্‌তে পারি
অশান্ত ব্যাকুলতা,
যেনো এগিয়ে যেতে পারি উৎসাহের সাথে
নূতনের সন্ধানে-
আর পরিচিত হোতে পারি
নূতনের অগ্রদূত রূপে।"

প্রথমেই আমরা ইক্‌বাল-দর্শনের চরম লক্ষ্যের বিষয় আলোচনা কর্‌তে পারি। এ আলোচনার ফলে আমরা তাঁর লক্ষ্যবস্তুটি নির্দেশ কর্‌তে পারলে তাঁর দর্শনের ধারা স্থির কর্‌তে পার্‌বো। ইক্‌বাল ইউরোপীয় সাহিত্যের সুধাপাত্র উজাড় ক'রে পান ক'রেছিলেন। তাঁর দর্শন নিট্‌শে ও বার্গসঁ'র কাছে অনেকখানি ঋণী। তাঁর কাব্য মনে করিয়ে দেয় মহাকবি শেলীর ভাবালুতা। তথাপি তিনি চিন্তা করেছেন ও উপলব্ধি করেছেন সত্যিকার মুসলমানের দৃষ্টিভংগিতে। সেই জন্যই তাঁর দর্শন এত গভীরভাবে প্রভাবম্বিত করেছে মানুষকে, তিনি ছিলেন আগাগোড়া ধর্মানুপ্রাণিত, স্বপ্ন দেখ্‌তেন এক নব মিলন ক্ষেত্রের যেখানে বিশ্বমুসলিম দেশ-বর্ণের বৈষম্যের উর্ধ্বে হবে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত-পরিপূর্ণ এক। জাতীয়তাবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের স্থান ছিলো না তাঁর কাছে। এ সব মতবাদ তাঁর মতে 'হরণ করে আমাদের স্বর্গ-সুখ' আমাদের পারস্পরিক অনুভূতির আঁখিকে করে অন্ধ, ভ্রাতৃত্বের উপলব্ধিকে করে ধ্বংস আর বপন করে সংগ্রামের তিক্ত বীজ, তিনি কল্পনা কর্‌তেন একটা বিশ্বের ধর্ম-দ্বারা শাসিত, রাজনীতি দ্বারা নয়, নিন্দা কর্‌তেন তাদেরকে, যারা মিথ্যা দেবতার পূজারী-যারা অন্ধ করেছে অনেককে! ইক্‌বালের চিন্তাধারার আলোচনা কর্‌লে দেখা যায় যে, তিনি ধর্ম বল্‌তে ইস্‌লামকে বুঝতেন।

একটা মুক্ত-স্বাধীন মুসলিম ভ্রাতৃত্ব কেব্‌লা যার কাবা, সংঘবদ্ধ এক আল্লাহর প্রেমে আর তাঁর প্রিয় পয়গাম্বরের ভক্তিতে-এই ছিলো ইক্‌বালের আদর্শ। তিনি এই আদর্শ প্রচার করেছেন অতুলনীয় আন্তরিকতার সাথে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ- "আসরারে খুদী" ও "রামুজে বেখুদী"তে। তিনি তাতে দেখিয়েছেন-কি করে এ লক্ষ্যে পৌছ্‌তে পারা যায়। "আসরারে খুদী" মুসলিম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ও "রমুজে বেখুদী" মুসলিম জাতির জাতীয় জীবনের প্রেরণার উৎস।

কোরান ও হয্‌রত মুহাম্মদের (দ) আদর্শের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য বহু আন্দোলন আগেও হ'য়েছিলো, কিন্তু তা'তে সাড়া মিলেছে খুব কমই। ইক্‌বাল অবতীর্ণ হোলেন পাশ্চাত্য দর্শনের বিপ্লবাত্মক শক্তি নিয়ে। তিনি আশা কর্‌তেন ও আন্তরিকভাবে বিশ্বাস কর্‌তেন যে, তাঁর দর্শন এই আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী ক'রে তুল্‌বে ও তার বিজয় এনে দেবে। তাঁর মতে, হিন্দু জ্ঞানবাদ ও মুসলিম অদ্বৈতবাদ ধ্বংস করেছে কর্মশক্তিকে–যার পূর্ণ বিকাশ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ও প্রকৃতির পূর্ণ উপলব্ধিতে। এই

কর্মশক্তিই কীর্তিমান করেছে পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে, বিশেষ করে ইংরেজ জাতিকে। এই শক্তি নির্ভর করে একটিমাত্র বিশ্বাসের উপর যে, 'খুদী' (অহম্) সত্য-শুধু অন্তরের ভ্রান্তি মাত্র নয়। মহাকবি ইক্‌বাল তাই নিজেকে পূর্ণ শক্তিতে ভাববাদী দার্শনিক ও মিথ্যা রহস্যবাদী কবি-সাহিত্যিকদের মতের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেছিলেন-যারা ইস্‌লামের ধ্বংসকারী। তাঁর মতে, মুস্‌লিম আবার মুক্ত-আজাদ হোতে পারে-শক্তিমান হোতে পারে–শুধু আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রকাশ ও আত্মশক্তির বর্ধন দ্বারা। তিনি হাফিযের মুগ্ধকর কলোচ্ছাস থেকে আবর্তন কর্‌তে বলেন জালাল উদ্দীন রুমীর নীতিবাদে, প্লেটোবাদীর তন্দ্রালস ইস্‌লাম থেকে সতেজ, সজীব, কর্মময় অদ্বৈতবাদে যা' একদিন অনুপ্রেরণা দিয়েছিলো মহাপুরুষ হয্‌রত মুহাম্মদকে আর অস্তিত্বে আনয়ন করেছিলো ইস্‌লামের মতো মহাধর্মকে।*

ইক্‌বালের দর্শন ধর্মদর্শন। কিন্তু দর্শনকে কোনো দিন তিনি ধর্মের পরিচারিকা বলে মনে করেন নি। তাঁর মতো ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশেই সমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা এবং তিনি আদর্শ সমাজ বল্‌তে বুঝ্‌তেন হয্‌রত মুহাম্মদের (দ) প্রচারিত সত্যিকার ইস্‌লাম। প্রত্যেক মুস্‌লিম পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'য়ে সাহায্য কর্‌ছে বিশ্বের বুকে আল্লাহর শান্তির রাজ্য স্থাপনে-এই ছিলো তাঁর ধারণা। "রমুজে বেখুদী" গ্রন্থে তাঁর এই মতবাদ প্রচারিত হয়েছে।

"আস্‌রারে খুদী" ছন্দ ও রচনাভঙ্গি রুমীর মসনভী কাব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইক্‌বালের সাথে জালাল উদ্দীন রুমীর সম্বন্ধ কতোখানি, তা' বল্‌তে গেলে দান্তের সাথে ভার্জিলের সম্বন্ধের কথাই বল্‌তে হয়। "আসরারে খুদী"র পূর্বাভাষ অধ্যায়ে কবি সুন্দর বর্ণনা করেছেন, কিভাবে জালাল উদ্দীন রুমী স্বপ্নে অবতীর্ণ হয়ে তাঁকে আদেশ করলেন উত্থান কর্‌তে আর সংগীতের যাদুতে বিশ্বকে বিমুগ্ধ কর্‌তে।

"আমি জেগে উঠ্‌লাম,
যেমন করে জাগে সংগীত তন্ত্রী থেকে,
নির্মাণ কর্‌তে এক ফির্‌দাউস
মানব-কর্ণের জন্য।"

ইক্‌বাল হাফিযের প্রদর্শিত সুফীবাদকে যেমন সমর্থন কর্‌তেন না, তেমনি তিনি শ্রদ্ধায় অবনমিত হোতেন ইরানের বিখ্যাত কবি-দার্শনিক

জালাল উদ্দীন রুমীর স্বচ্ছ-গম্ভীর মহিমার কাছে,-যদিও তিনি রুমীর আত্ম-অস্বীকারের মতবাদ সমর্থন করেন নি কোনোদিন।

---

* ফারসী-কবি হাফিযের সমালোচনা প্রকাশের ফলে হাফিযের অনুগামীগণ ইকবালের তীব্র প্রতিবাদ করেন, কিন্তু কবি তার ফলে তাঁর মতবাদ প্রত্যাহার করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর তিনি "আসরারে খুদী" কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে অধ্যায়টি বাদ দেন। এই অনুবাদেও সেটি স্থান পায়নি।

ডাঃ নিকল্‌সনের অনুরোধে আল্লামা মুহাম্মদ ইক্‌বাল তাঁর দার্শনিক কাব্য "আস্‌রারে খুদী" তে প্রচারিত মতবাদ সম্পর্কে একটা বর্ণনা দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর এ বিবৃতি খুব ব্যস্ততার মধ্যে লেখা, তথাপি এর নিজস্ব ক্ষমতা ও মৌলিকতা ছাড়া এই কাব্যের মতবাদ ও যুক্তিগুলি পাঠকদের কাছে স্বচ্ছ স্থরে তোলাই এর সার্থকতা। নিম্নে কবির বিবৃতিটির অনুবাদ দেওয়া গেলো।

"আসরারে খুদী"র দার্শনিক ভিত্তি

"ভূয়োদর্শনের মূল সীমাবদ্ধ কেন্দ্রে এবং তার একটা সীমাবদ্ধ প্রকট রূপ লাভ করা প্রয়োজন–এই মতবাদ শেষ পর্যন্ত অব্যাখ্যেয়।" এ হচ্ছে প্রফেসর ব্রাড্‌লীর কথা। কিন্তু ভূয়োদর্শনের এই দুর্বোধ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে তিনি এমন এক ঐক্যে এসে সমাপ্তির রেখা টেনেছেন, যাকে তিনি বলেছেন পরমাত্মা (Aboslute) এবং যার ভেতরে সেই সীমাবদ্ধ কেন্দ্র শুধু একটা অনুভূতিমাত্র। বাস্তবের স্বাদ পাওয়া যায় সর্বাস্তর্নিবেশে ; এবং যখন সকল সীমাবদ্ধতা আপেক্ষিকতা দোষে সংক্রামিত,–এই তাঁর মত। এর মানে আপেক্ষিকতা হচ্ছে শুধু ভ্রান্তি মাত্র। আমার মতে, ভূয়োদর্শনের এই দুর্বোধ্য সীমাবদ্ধ কেন্দ্রই হচ্ছে বিশ্বের মূল সত্য। সকল জীবনই স্বতন্ত্র সত্তা ; বিশ্বজীবন বলে কোনো বস্তুই নেই। আল্লাহ্‌ নিজে এক অবিভাজ্য সত্তা ; তিনি হচ্ছেন অদ্বিতীয় অবিভাজ্য সত্তা। *ডাক্তার ম্যাক্‌টেগার্টের মতে, বিশ্ব হচ্ছে স্বতন্ত্র সত্তাসমূহের সমষ্টি ; কিন্তু আমাদের একথাও বল্‌তে হবে অবশ্যি যে, এর ভেতরে যে সুশৃংখলা ও ব্যবস্থাপনা আমরা লক্ষ্য করি, তা' চিরন্তন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তা' হচ্ছে স্বাভাবিক ও সচেতন প্রচেষ্টার পরিণতি। আমরা অনন্ত শূন্য থেকে ক্রমাগত পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করি ও এই পরিণতির সহায়তা করি। যাদেরকে নিয়ে এই সমষ্টি, তারা চিরস্থির নয়। নব নব সত্তা জন্মলাভ কর্‌ছে এই মহাকার্যে সহযোগিতা কর্‌বার জন্যে। কাজেই এ বিশ্ব একটি সম্পূর্ণ নাট্যাংক নহে ; ইহা এখনো 'সমগ্রে' পৌছায়নি। সৃষ্টির লীলা আজো অব্যাহতভাবে চলছে ; এবং মানুষও তাতে ততোটা অংশগ্রহণ কর্‌ছে যতোটা সে এই অন্তহীন কোলাহলকে নিয়ন্ত্রণাধীন কর্‌বার সাহায্য কর্‌ছে। কোরান শরীফ আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য স্রষ্টার সম্ভাবনা ঘোষণা করেছে।*

"স্পষ্টতঃ মানব ও বিশ্ব সম্বন্ধে এই ধারণা ইংরেজ নব-হেগেলীয় দার্শনিকগণের ও সকল প্রকার অদ্বৈত-পূজারী সুফিবাদের মত বিরোধী। তাদের মতে, বিশ্বজীবন বা বিশ্ব আত্মার মধ্যে সমাহিত হওয়া জীবনের শেষ লক্ষ্য বা মানবের মুক্তি পন্থা। মানবের নৈতিক বা ধর্মীয় আদর্শ আত্ম-অস্বীকারে নয়, বরং আত্ম-বিশ্বাসে ; এবং সে তার লক্ষ্যস্থলে পৌছায় অধিকতর স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। মহামানুষ হয্‌রত মুহাম্মদ (দ) বলেছেন,–"তাখাল্লাকু বিআখ্‌লাকিল্লাহ–আল্লাহর গুণ-রাজিতে সমৃদ্ধ হও।" এম্নি করে মানুষ পূর্ণতা লাভ করে ক্রমশঃ পূর্ণতম স্বতন্ত্র সত্তার গুণ অর্জন করে। তা' হোলে জীবন কি? জীবন হচ্ছে স্বতন্ত্র

---

* ইমাম আহ্‌মদ হাম্বলের মতবাদ।

* "মহিমা সেই আল্লাহর যিনি স্রষ্টাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।" কোরআন; ২৩-১৪ এখানে মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রদত্ত সৃষ্টি ক্ষমতার কথাই বলা হচ্ছে। মানুষ তার অনন্ত শক্তিকে কাজে ল্যাগিয়ে বিশ্বকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

সত্তা।" এর উচ্চতম স্তর হচ্ছে খুদী' বা অহম্-জ্ঞান, যাতে সেই স্বতন্ত্র সত্তা উপনীত হয় আত্মসমাহিত সীমাবদ্ধ কেন্দ্রে ; কিন্তু তখনো সে পরিপূর্ণ সত্তা নয়। আল্লাহ্ থেকে তার দূরত্ব যতো বেশী, সত্তা তার ততো অপূর্ণ। আল্লার নৈকট্য যে আত্মা লাভ করে, সে হয় পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সে পূর্ণ রূপে আল্লাতে সমাহিত হয় না। বরং আল্লাহ্ তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে মিশে যান।" সত্যিকার মানুষ শুধু বস্তুর জগতকে তাঁর ভেতর মিশিয়ে নেননা, বরং আত্মার উপরে প্রভুত্বসম্পন্ন হয়ে তিনি আল্লাকে তাঁর আত্মার ভেতর লীন করে দেন। জীবন একটা সমন্বয়শীল অগ্রগতি। সে তার পথের বন্ধনকে দূরীভূত করে দেয় তাদেরকে আপনার ভেতরে গ্রহণ করে। তার নির্যাস হচ্ছে ক্রমাগত আকাংখা ও আদর্শ-সৃষ্টিতে ; এবং তার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য আবিষ্কার করেছে অথবা আপনার ভেতর থেকে সৃষ্টি করেছে কতগুলি যন্ত্র-বোধ, জ্ঞান প্রভৃতি, যাতে সহায়তা কর্ছে তাকে সকল বাধা-বন্ধনকে গ্রাস কর্তে। জীবনের পথে সব চাইতে বড়ো বাধা হচ্ছে বস্তু-প্রকৃতি, প্রকৃতি তথাপি একটা অপকৃষ্ট কিছু নয়, বরং সে সহায়তা করে জীবনের অন্ত র্নিহিত শক্তিকে সপ্রকাশ কর্তে।

"আত্মা মুক্তিলাভ করে তার পথের সকল বাধা দূরীকরণ দ্বারা। ইহা আংশিকভাবে মুক্ত, আংশিকভাবে অবধারিত", এবং সে পূর্ণতম মুক্তিতে পৌঁছে মুক্ততম সত্তা আল্লার সান্নিধ্য লাভ করে। এক কথায় জীবন হচ্ছে মুক্তি-সংগ্রাম।

আত্মা এবং ব্যক্তিত্বের ক্রমবাদ

"মানুষের ভেতরে জীবন-কেন্দ্র পরিণত হয় আত্মা বা ব্যক্তিতে। ব্যক্তিত্ব হচ্ছে সম্প্রসারণশীলতায় এবং তা' বজায় থাকে ততোদিন, যতোদিন এইভাবে সংরক্ষিত হয়। যদি এই সম্প্রসারণশীলতা সংরক্ষিত না হয় তা হোলেই আসে শ্লথন। যতোক্ষণ ব্যক্তিত্ব বা সম্প্রসারণশীল মনোবৃত্তি মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতম বিশেষত্ব বলে বিবেচিত হয়, ততোক্ষণ সে শ্লথ মনোভাব আস্তে দেয় না নিজের মধ্যে। যা' কিছু এই সম্প্রসারণশীল মনোবৃত্তিকে বজায় রাখে, তাই আমাদেরকে করে তোলে অমরতার দাবীদার। এম্নি করেই ব্যক্তিত্বের ধারণা আমাদেরকে এনে দেয় একটা মান-বোধ (Standard of value)। ভালোমন্দের প্রশ্নের সমাধান হয় তাতেই। ব্যক্তিকে সংরক্ষিত করে যা' কিছু তাই উৎকৃষ্ট ; আর যা' কিছু দুর্বল করে তাকে, তাই অপকৃষ্ট। ব্যক্তিত্বের মূল তথ্য দিয়ে বিচার কর্তে হবে সব কলা, * ধর্ম ও নীতিবাদকে। মৎকর্তৃক প্লেটোর সমালোচনা সেই সব দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধে, যা' জীবনের চাইতে মৃত্যুকে করে তোলে বৃহত্তর

* মহাকবি ইকবালের মতে মানব-জীবনের সকর কর্মশক্তির শেষ লক্ষ্য হচ্ছে এক জীবন- মহিমান্বিত, শক্তিমান, উচ্ছ্বসিত। সকল মানবীয় কলা এই শেষ লক্ষ্যের অধীন এবং সকল জিনিষের মূল্য নিরূপণ করতে হবে তার জীবন-সংরক্ষনী শক্তির মানদণ্ড দিয়ে। সেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম কলা- যা জাগ্রত করে দেয় আমাদের ঘুমন্ত ইচ্ছাশক্তিকে এবং শক্তিমান করে তোরে আমাদের অন্তরকে জীবনের সকল বাধা-বিঘ্নকে মানুষের মতো অতিক্রম করতে। যা' কিছু তন্দ্রাভিভূত করে আমাদে কে এবং আমাদের চক্ষুকে অন্ধ করে দেয় চারিদিকের বাস্তব থেকে- শুধু যার উপর প্রভুত্বে নির্ভর করে এ জীবন; তা' হচ্ছে ধ্বংসের এবং মৃত্যুর বাণী। কোনো কলর লক্ষ্য হোতে পারে না অহিফেনসেবীর নিদ্রা। "Art of the sake of art" এর মতবাদ হচ্ছে একটা সুচতুর উদ্ভাবন আমাদেরকে জীবন ও শক্তি থেকে বঞ্চিত করবার জন্যে।

আদর্শ–যে মতবাদ জীবনের বৃহত্তম বিঘ্ন বস্তুকে করে অস্বীকার এবং আমাদেরকে পলায়ন কর্‌তে বলে তা থেকে–তাকে গ্রাস কর্‌বার পরিবর্তে।

"আত্মার মুক্তি সম্বন্ধে যেমন আমাদেরকে বস্তু-সমস্যার সম্মুখীন হোতে হয়, ঠিক তেম্নি তার অমরতা সম্বন্ধে কালের সমস্যার সম্মুখীন হোতে হয়। * বার্গসঁর মতে, জীবন একটি অনন্ত রেখা নয়,–যাকে অতিক্রম কর্‌তে হয় আমাদের ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়। কালের এই ধারণা বিকৃত। সত্যিকার সময়ের কোনো দৈর্ঘ্যই নেই। ব্যক্তিগত অমরতা একটা আকাংখা, তুমি তা লাভ করতে পার, যদি তুমি তা লাভের জন্য উদ্যমশীল হও। তা নির্ভর করে আমাদের জীবনে এমন ধারণা ও কর্মপন্থা অবলম্বনের উপর, যা জীবনকে পরিচালিত করে বিস্তৃতির দিকে। বৌদ্ধ মতবাদ, পারস্য সুফিবাদ ও নীতিবাদের সম্মিলিত আকার আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না। কিন্তু এসব মতবাদ সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়, কারণ কর্মের পরে কিছুকাল আমাদের প্রয়োজন হয় নিদ্রাকর ঔষধের। জীবনে দিবসের মধ্যে এই সকল ধারণা ও কর্ম হচ্ছে রাত্রির মতো। যদি আমাদের কর্মধারা সম্প্রসারণশীলতার সহায়ক হয়, তা হলে মৃত্যুর আঘাতও তাকে অভিভূত করে না। মৃত্যুর পরে একটা শ্লথনের অবকাশ আসতে পারে,– যাকে কোরান বলেছে বর্‌জখ বা রোজক্বিয়ামতের (পুনর্জাগরণ দিবস) পূর্ববর্তীকাল। শুধু সেই সকল আত্মাই এই অবস্থা থেকে জাগ্রত হবে, যারা বর্তমান জীবনের সদ্ব্যবহার করেছে। যদিও জীবন তার ক্রমবিবর্তনে পুনরাবৃত্ত হয় না, তথাপি বার্গসঁর দৈহিক পুনর্জাগরণের মতবাদ ওয়াইল্‌ডন্‌ কারের মতে সম্পূর্ণ সম্ভব। সময়কে মুহূর্তে বিভক্ত করে আমরা তাকে সীমাবদ্ধ করি এবং পরে তাকে জয় করা দুরুহ বোধ করি। সময়ের সত্যিকার প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায়, যখন আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি আমাদের গভীরতম আত্মার দিকে। সত্যিকার সময় হচ্ছে জীবন নিজেই, যা' আপনাকে সংরক্ষিত করতে পারে সেই নির্দিষ্ট সম্প্রসারণশীলতা (ব্যক্তিত্ব) বজায় রাখার ভেতর দিয়ে। আমরা সময়ের অধীন, যতোক্ষণ আমরা সময়কে দেখি সীমাবদ্ধরূপে। সীমাবদ্ধ কাল হচ্ছে একটা নিগড়, যা' জীবন তার নিজের জন্য আবিষ্কার করেছে বর্তমান পারিপার্শ্বিকতাকে হজম করার জন্যে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা কালের সীমার উর্ধ্বে, আমদের জীবনে কালের সীমাহীনতা উপলব্ধি করা যেতে পারে।

আত্মার শিক্ষা

"আত্মা সংরক্ষিত হয় প্রেম (ইশ্‌ক) দ্বারা। এই শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত এবং সকল কিছুকে আত্ম-সমাহিত করা বা গ্রহণ করার ইচ্ছা বুঝায়। এর উচ্চতর রূপ হচ্ছে মূল্য বা আদর্শ সৃষ্টি ও তাকে উপলব্ধি করায়। প্রেম মহান করে তোলে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে। সর্বোত্তম অবিভাজ্য সত্তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা মহান করে তোলে অনুসন্ধিৎসুকে এবং তার প্রেমাস্পদের গুণ সপ্রকাশ করে, কারণ অন্য কিছুতেই অনুসন্ধিৎসুর প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করে না। যেমন প্রেম আত্মাকে করে শক্তিমান, তেম্নি ভিক্ষাবৃত্তি (সু'আল) তাকে করে দুর্বল। যা কিছু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ব্যতীত লব্ধ, তা' সবই সু'আলের অন্তর্গত। যে ধনীপুত্র পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী, সেও ভিক্ষাজীবী, তেম্নি

যারা অন্যের চিন্তাকে নিজের মনে করে। আত্মাকে সংরক্ষিত করার জন্য আমাদেরকে কর্তে হবে প্রেমের চাষ– সমন্বয়শীল কর্মপন্থা অবলম্বন ও সর্বপ্রকার ভিক্ষাবৃত্তি বা কর্মহীনতা বর্জন। সমন্বয়শীল কর্মের শিক্ষা দিয়ে গেছেন মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (দ)–অন্ততঃ প্রত্যেক মুসলিমকে।

"কাব্যের একাংশে" আমি মুস্‌লিম নীতিবাদের মূলভিত্তির আলোচনা করেছি এবং ব্যক্তিত্বের ধারণার অর্থ সপ্রকাশ কর্তে চেষ্টা করেছি। আত্মা তার পূর্ণতার গতিপথে তিনটি স্তর অতিক্রম করে থাকে ঃ-

ক) আইন ও নিয়মের অনুবর্তিতা,

খ) আত্মশাসন–আত্ম-চেতনার উচ্চতম রূপ,

গ) আল্লার প্রতিনিধিত্ব।

"ঐশী প্রতিনিধিত্ব বা নি'আবত-ই-ইলাহী পৃথিবীতে মানবতার পূর্ণ বিকাশের তৃতীয় বা সর্বশেষ স্তর। নায়েব হচ্ছেন পৃথিবীতে আল্লার প্রতিনিধি। তিনি হচ্ছেন পরিপূর্ণ আত্মা, মানবতার পূর্ণ বিকাশ,* জীবনে দেহ ও মনের সর্বোচ্চ সীমা; মানসিক জীবনে সকল অনৈক্যকে আনেন সাম্যে। উচ্চতম শক্তি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয় উচ্চতম জ্ঞানের সাথে। তাঁর জীবনে চিন্তায় ও কর্মে সহজাত প্রবৃত্তি ও বিচারশক্তি এক হয়ে যায়। তিনি মানবতা-বৃক্ষের শেষ ফল ; এবং সকল বেদনাত্মক বিবর্তন সমর্থিত হয় তাঁর আগমনের জন্য। তিনি মানব-জাতির সত্যিকার শাসক ; রাজ্য তার পৃথিবীতে আল্লার রাজ্য। তাঁর প্রকৃতির প্রাচুর্য থেকে তিনি জীবন-সম্পদ বিতরণ করেন অন্যের উপর এবং নিকটতর করেন তাদেরকে। যতোই আমরা অগ্রসর হই বিবর্তনের পথে, তাঁর নিকটতর হই আমরা ততোই। তাঁর নিকটতর হয়ে আমরা উন্নীত করি নিজেদেরকে জীবনমানে। মানবতার মানসিক ও দৈহিক ক্রমবর্ধন তাঁর জন্মের পূর্বাবস্থা। বর্তমানে তিনি শুধু একটি আদর্শ কিন্তু মানবতার ক্রমবিবর্তন এমন এক জাতির জন্মের সম্ভাবনা আন্‌ছে যারা কম-বেশী করে অতুলনীয় সত্তার সমন্বয়ে হবে তাঁর যোগ্য জনক-জননী। এইভাবে পৃথিবীতে আল্লার রাজ্য মানে কম-বেশী করে অতুলনীয় সত্তাসমূহের এক সাধারণতন্ত্র, যার নায়ক পৃথিবীর সর্বোত্তম স্বতন্ত্র সত্তা। নীট্‌শের এম্নি একটা আদর্শ জাতির ধারণা ছিলো, কিন্তু তার নাস্তিকতা ও অভিজাত মতবাদ সমস্ত ধারণাটাকে বিনষ্ট করেছিলো।"

"আস্‌রারে খুদী" পাঠকদের মনের উপর নিশ্চিত ছায়াপাত কর্বে। এই কাব্যের দর্শন একটু আলাদাভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এর চিন্তা ও বর্ণনার উচ্চতা অস্পষ্টতর, এর ন্যায়ের ঔজ্জ্বল্য ভাব ও কল্পনাকে করে অনুজ্জ্বল এবং তা' হৃদয়কে জয় করে মনের অধিকার লাভের পূর্বেই। এই কাব্যের শিল্পনৈপুণ্য অনন্য-সাধারণ। এর অনেক অধ্যায় পাঠকের মনে এমনভাবে অংকিত হয়ে যায় যে, খুব সহজে ভোলা যায় না। আদর্শ মানুষের বর্ণনা ও শেষ প্রার্থনাটি এদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। জালাল-উদ্দীন রুমীর মতো ডাঃ ইকবালও তাঁর বর্ণনাকে সহেজ করবার জন্য কাহিনীর অবতারণা করেছেন সর্বত্র। ইকবালের প্রশংসায় বলা হয়েছে,–"ইকবাল আমাদের মাঝে এসেছেন মসিহের মতো,

* মানুষের ভেতর ঐশী প্রতিনিধিত্বের শক্তি নিহিত আছে। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন- "ওগো আমি-প্রেরণ করবো এক প্রতিনিধি (খলিফা) বিশ্বের বুকে। ২:২৮

তিনি মৃতকে দান করেছেন জীবন-ধারা।" ইকবালের কাব্যের মূল সুরটি অনেক পাঠকের কাছে অস্পষ্ট মনে হয়, কিন্তু কবির চিন্তাধারার সাথে নিবিড় পরিচয় ঘটলে সে অস্পষ্টতা আর থাকে না।

তাঁর কথা আরো বলা হয়েছে,–"তিনি তাঁর যুগের মানুষ, তিনি অনাগত যুগেরও মানুষ, আরো তিনি তাঁর নিজের যুগের সাথে ঐক্যহীন মানুষ।" একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, ইকবালের দর্শন-ধারা মুসলিম জাতির জীবনে একটা গতির সূচনা করেছে।

বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে ইকবালের দার্শনিক মতবাদ সুপরিচিত করে তোলাই এ অনুবাদের লক্ষ্য। মূলকাব্যের ভাব বজায় রাখার জন্যই গদ্য-কাব্যে এর অনুবাদ করেছি, একে ছন্দোবদ্ধ করতে চেষ্টা করিনি। যদি এ অনুবাদ পাঠককে আনন্দ দান করে, তার কৃতিত্ব মহাকবি ইকবালের; আর যদি কোথাও তাদেরকে আশানুরূপ আনন্দ দান না করে, সে ত্রুটি অনুবাদকের।

মূল গ্রন্থ প্রকাশের পর তিন দশক অতীত হয়ে গেলো। এর মধ্যে "আসরারে খুদী"র বাংলা অনুবাদ প্রকাশের কোনো প্রচেষ্টা হয়েছে বলে জানি না। মূল গ্রন্থ প্রকাশের পাঁচ বছরের মধ্যে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় এর সম্পূর্ণ অনুবাদ ইতিপূর্বে বেরিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের এই অভাব পূরণের জন্য আমার এ দীন প্রচেষ্টা। সাফল্য বিচারের ভার আমার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের উপর।

কবি-বন্ধু আহসান হাবীবের অনুপ্রেরণায় এ অনুবাদ আরম্ভ করি। আজ এ অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশের দিনে তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি। কবি গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, মতিউল ইসলাম, অশোকচন্দ্র রায়, জিতেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ সুধীগণ আমায় উৎসাহ দিয়েছেন। ফররুখ আহমদ মহাকবি ইকবালের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখে দিয়ে আমায় গৌরবান্বিত করেছেন। পরম স্নেহভাজন কিশোর বন্ধুদের কাছ থেকেও যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছি। সানন্দে এঁদের সকলের ঋণ স্বীকার করছি। অগ্রজপ্রতিম মওলবী আবদুল জব্বার সাহেব এর মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেছেন। তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রীতি।

ইকবাল সাহিত্যের রস-পিপাসুগণকে এ অনুবাদ আনন্দ দান করলেই আমার শ্রম সার্থক।

'আজাদ' কার্যালয়
কলিকাতা

সৈয়দ আবদুল মান্নান

নভেম্বর, ১৯৪৫

আসরারে খুদী

পূর্বাভাষ

বিশ্ব-উজ্জ্বলকারী সূর্য
যখন ঝাঁপিয়ে পড়লো রাত্রির বুকে
দস্যুর মতো,
আমার কান্নার অশ্রু
শিশির-সিক্ত করে তুললো
গোলাব-পাপড়ির মুখ।
আমার অশ্রু
ধুয়ে নিয়ে গেলো নিদ্রা
নার্গিস ফুলের আঁখি থেকে,
আমার অনুরাগ
জাগ্রত করে দিলো তৃণরাজিকে
আর করলো তাদেরকে বর্ধিষ্ণু।
মালী পরীক্ষা করলে
আমার সংগীতের শক্তি,
সে বপন করলো আমার সংগীত
আর আহরণ করলো একখানি তরবারি।
মৃত্তিকার বুকে
সে বপন করলো আমার অশ্রুর বীজ,
বয়ন করলো আমার আর্তনাদ
বাগিচার সাথে
তাঁতের সূত্রের মতো।

যদিও আমি একটি ক্ষুদ্র পরমাণু মাত্র,
তবু অত্যুজ্জ্বল বিভাময় সূর্য আমারই ;
বক্ষোমাঝে আমার
শতেক পূর্বাশার আলো।
আমার ধূলিকণা
জামশেদের সুরাপাত্রের চাইতে উজ্জ্বলতর,
সে জানে সেই সব পদার্থকে
যারা আজও জন্ম নেয়নি এই বিশ্বে।

আমার চিন্তাধারা
ছিনিয়ে এনেছে এক মৃগীকে,
যে আজও ছুটে আসেনি প্রকাশমান হয়ে
অনস্তিত্বের অন্ধকার থেকে।
সুন্দর আমার বাগিচা,
পত্রপুট তার তারুণ্যে সবুজ ;
আমার পরিচ্ছদের মাঝে
লুকায়িত আছে
কতো অস্ফুট গোলাব।
মূক করে দিয়েছি আমি সেই গায়কমণ্ডলীকে
যারা মিলিত হয়েছিলো
এক জলসায়,
আঘাত দিয়েছি আমি
সারা বিশ্বের হৃদয়-গ্রন্থিতে,
কারণ আমার প্রতিভার বাঁশিতে
নিহিত রয়েছে
এক অভূতপূর্ব সুর ;
সংগীত আমার নূতনতম
আমার সংগীদের কাছেও।
জন্ম নিয়েছি আমি এই ধরিত্রীর বুকে
নবীন সূর্যের মতো,
আকাশের নীহারিকা-লোকের সাথে
নেই আমার পরিচয় ;
এখনো আত্মগোপন করেনি তারকারাজি
আমার আলোকৈশ্বর্যের সম্মুখে,
আমার তাপমানের পারদা আজো হয়নি স্থির ;
আমার নৃত্যপর আলোকরশ্মি
আজো স্পর্শ করেনি সমুদ্রের বুক,
আমার রক্তিম আভা
আজো স্পর্শ করেনি পর্বতের শিখর।
অস্তিত্বের আঁখি
আজো নহে পরিচিত
আমার কাছে ;
জাগ্রহ হয়ে উঠি আমি কম্পায়মানভাবে,
ভীত আমি নিজেকে প্রকাশ করতে
আমার ঊষা সমাগত হোল

প্রাচী-র তোরণ থেকে
আর মিশে গেলো রাত্রির অন্ধকারে,
একটি নবীন শিশির বিন্দু
পড়লো বিশ্ব-গোলাবের মুখে।
প্রতীক্ষা করছি আমি সেই ভক্তদের
যারা উত্থান করে উষালোকে ;
ওগো সুখী তারাই,–
যারা পূজা করবে আমার অন্তরের অগ্নিকে।
প্রয়োজন নেই আমার আজকের মানুষের কর্ণের
আমি বাণী
অনাগত যুগের কবির।
হৃদয়ংগম করে না আমার বাণীর গূঢ় অর্থ
আমার নিজের যুগ,
ইউসুফ আমার এই বাজারের জন্য নয়!
হতাশ আমি আমার প্রাচীন সংগীদের জন্য ;
আমার সিনাই দগ্ধ হয়
সেই মুসার জন্য–
যে আসবে ভবিষ্যতে।
সমুদ্র তাদের শান্ত নিস্তরংগ
শিশিরের মতো,
কিন্তু শিশির আমার ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ
মহাসমুদ্রের মতো।
আমার সংগীত আর এক পৃথক জগতের
তাদের থেকে ;
এই বংশী আহবান করে আর সব পথচারীকে
পথ ধরবার জন্য।

জন্ম নিয়েছিলো কতো কবি
তার মৃত্যুর পরে,
খুলে দিয়েছিলো আমাদের আঁখি
যখন তার নিজের আঁখি হোল নিমিলিত।
চলতে লাগলো আবার সম্মুখের দিকে
অনস্তিত্ব থেকে,
ফুটনোন্মুখ গোলাবের মতো
তার সমাধি-মৃত্তিকার উপর।
যদিও কতো কাফেলা

অতিক্রম করে গেছে এই মরুভূমি,
তারা চলেছিলো,
যেমন চলে উষ্ট্র
নিঃশব্দ পদক্ষেপে।
আমি একজন প্রেমিক ;
উচ্চ নিনাদ আমার ধর্ম ;
রোজ কেয়ামতের চীৎকার
আমার কাছে তোষামোদ।
আমার সংগীত
তন্ত্রীর শক্তিকে করেছে অতিক্রম
তবু আমার ভয় নেই বাঁশী ভেঙে যাবার।
আমার স্রোতের সাথে পরিচয় না হওয়াই ছিলো ভালো
সেই বারি-বিন্দুর,
তার ভয়ংকর রূপ উন্মাদ করে দেবে
মহাসমুদ্রকে।
কোনো নদী
ধরতে পারবে না আমার ওমানকে ;
সমস্ত সমুদ্রের প্রয়োজন
ধরে রাখতে আমার বাত্যা।
যদি কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হয়ে
না হয় গোলাবের আস্তরণ,
কোনো মূল্য নেই
আমার বসন্ত-মেঘের করুণার।
বিদ্যুৎ-ঝলক তন্দ্রাবিভূত হয়ে আছে
আমার আত্মার ভিতরে।
বয়ে চলি আমি
পর্বত ও সমতলের উপর দিয়ে।
যুদ্ধ কর আমার সমুদ্রের সাথে,
যদি তুমি হও সমতলক্ষেত্র ;
গ্রহণ করো আমার বিদ্যুৎ-চমক,
যদি তুমি হও সিনাই।
আমায় দেওয়া হয়েছে আবে-হায়াত
পান করতে,
আমি হয়েছি মহাজ্ঞানী
জীবন-রহস্যের।
ধুলিজাল শক্তি সঞ্চয় করেছে

আমার অগ্নি-গীতি থেকে ;
বিস্তার করেছে সে তার পক্ষ,
পরিণত হয়েছে খদ্যোতে।
কেউ বলেনি সেই রহস্য, যা' বলবো আমি,
অথবা বিস্তার করেনি চিন্তার রত্ন
আমার মতো।
এসো,–
যদি তুমি জানতে চাও
চিরন্তন জীবন-রহস্য।
এসো–
যদি তুমি চাও
স্বর্গ-মর্ত্যকে জয় করতে!
স্রষ্টা শিখিয়েছেন আমায়
এই সংগীত,
আমি পারি না তা' গোপন করতে
আমার সংগীদের কাছ থেকে।
ওগো সাকী!
ওঠ,–ঢালো সুরা আমার পাত্রে,
কালের কোলাহলকে করো দূরীভূত
আমার অন্তর থেকে!
জম্‌জম্‌ থেকে বয়ে আসে
যে উজ্জ্বল সুরা,
যদি ভিখারীও করে তার পূজা
সে হয়ে উঠবে রাজ্যেশ্বর।
তাতে চিন্তাকে করে তোলে
আরো প্রশান্ত–জ্ঞানময়,
তীক্ষ্ণ আঁখিকে করে তোলে তা' তীক্ষ্ণতর।
তৃণকে সে প্রদান করে পর্বতের ভার,
শৃগালকে দেয় সিংহের শক্তি।
ধূলিকণাকে তা' তুলে নেয় সপ্তর্ষি-মণ্ডলে,
আর বারিবিন্দু ফুটে উঠে
ধারণ করে সমুদ্রের আকার।
রোজ কেয়ামতের কোলাহলের মাঝে
আনে সে গভীর নিস্তব্ধতা
তিতির পক্ষীর পদযুগল রঞ্জিত করে সে
বাজ পক্ষীর শোণিতে।

ওঠ,–ঢালো আমার পিয়ালায়
স্বচ্ছ সুরা,
এনে দাও চন্দ্রালোক
আমার চিন্তার অন্ধকার নিশীথিনীর বুকে,
যেনো আমি পারি
ফিরিয়ে আনতে মুসাফেরকে তার গৃহে,
আলস্যপরায়ণদের মাঝে আনতে পারি
অশান্ত ব্যাকুলতা ;
যেনো এগিয়ে যেতে পারি উৎসাহের সাথে
নূতনের সন্ধানে–
আর পরিচিত হোতে পারি
নূতনের অগ্রদূতরূপে ;
অক্ষি-তারকার মতো হোতে পারি
অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন মানবের কাছে,
যেনো প্রবিষ্ট হোতে পারি বিশ্বের কর্ণে
কণ্ঠস্বরের মতো ;
বর্ধন করতে পারি কাব্যের মূল্য,
আর অভিষিক্ত করতে পারি
শুষ্ক গুল্মকে
আমার অশ্রুবিন্দু-পাতে।
রুমীর প্রতিভায় অনুপ্রাণিত আমি
আবৃত্তি করে যাই গোপন রহস্যের মহাগ্রন্থ।
আত্মা তার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড,
আমি শুধু স্ফুলিঙ্গ–
যা জ্বলে ওঠে মুহূর্তের জন্য।
জ্বলন্ত দীপশিখা তাঁর
গ্রাস করেছে আমায় পতংগের মতো,
তাঁর সুরা
কানায় কানায় পূর্ণ করেছে আমার পিয়ালা।
রুমী স্বর্ণে পরিণত করেছিলেন
আমার মৃত্তিকাকে,
আর আমার ভস্মকে করেছিলেন
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড।
বালুকণা উঠে এলো মরুভূমি থেকে,
যেনো সে ছিনিয়ে আনতে পারে
সূর্যের ঔজ্জ্বল্য।

আমি একটি তরংগ
আসবো আমি বিশ্রাম নিতে
তাঁর সমুদ্র-বুকে,
যেনো আমি আপনার করে নিতে পারি
তাঁর দীপ্তিমান মুক্তারাজি।
আমি তাঁর সংগীতের সুরায় মাতাল,
জীবন সঞ্চয় করি আমি
তাঁর বাণীর হাওয়া থেকে।
তখন রাত্রি,
অন্তর আমার শোকোচ্ছাসে পরিপূর্ণ,
নিস্তব্ধতার বুক ভরে দিলো
আমার ফরইয়াদ
বিশ্বপ্রভুর কাছে।
অভিযোগ করছিলাম আমি
বিশ্বের দুঃখ-ব্যথার জন্য,
বিলাপ করছিলাম
আমার পিয়ালার শূন্যতায়।
অতঃপর আঁখি আমার
পারলো না আর সহ্য করতে,
পরিশ্রান্ত হয়ে অচেতন হয়ে পড়লো
গভীর ঘুমে।
আবির্ভূত হোলেন সেই পীর,
সত্যের উপাদানে যিনি গঠিত,–
লিখেছিলেন যিনি কোরান ফারসী ভাষায়।
বললেন তিনি,–
"ওগো উন্মত্ত প্রেমিক,
পান করে নেও প্রেমের স্বচ্ছ সুরা।
আঘাত করো তোমার হৃদয়-গ্রন্থিতে,
জাগিয়ে তোল তাতে উদাত্ত সুর,
নিক্ষেপ করো তোমার মস্তক পিয়ালায়
আর তোমার আঁখি অস্ত্রমুখে!
করে তোল তোমার হাস্য
শতেক দীর্ঘশ্বাসের উৎসমুখ,
মানবের অন্তর হোক রক্তাক্ত
তোমার অশ্রুজলে!
কতোকাল থাকবে তুমি নীরব

কুঁড়ির মতো?
বিক্রয় করো তোমার সুরভী সুলভে
গোলাবের মতো।
জিহবা তোমার আড়ষ্ট বেদনায় ;
নিক্ষেপ করো নিজকে অনল-কুণ্ডে
ইন্ধনের মতো!
ঘন্টার মতো ভঙ্গ করো নিস্তব্ধতা,
আর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে
উচ্চারণ করো বিলাপ-ধ্বনি।
তুমি অগ্নি ঃ
পরিপূর্ণ করো সারা বিশ্ব
তোমার আলোয়।
দগ্ধ করো অপরকে তোমার দাহনে।
ঘোষণা করো রহস্য
সেই প্রাচীন সুরা-বিক্রেতার ;[১]
তুমি হও সুরার তরঙ্গ,
স্বচ্ছ পিয়ালা হোক তোমার বসন।
চূর্ণ-বিচূর্ণ করো ভয়ের দর্পণকে,
বোতল ভেঙ্গে দাও বাজারের মধ্যে!
নলের বাঁশীর মতো
নিয়ে এসো বাণী নল-বন থেকে ;
মজনুর কাছে বয়ে আন সন্দেশ
লায়লার কাছ থেকে!
সৃষ্টি করো নূতন ধারা তোমার সংগীতের,
ঐশ্বর্যশালী করে তোল সমাজকে
তোমার উদ্যমে।
ওঠ, প্রেরণা দাও আবার
প্রত্যেক জীবিত আত্মাকে ;
বলো,–'জাগ্রত হও,'–
আর তোমার বাণীর যাদুতে
জেগে উঠুক জীবন্ত আত্মা!
ওঠ,–বাড়িয়ে দাও তোমার চরণ
অন্যতর পথে ;
দূর করো সব অতীতের
এক-ঘেয়েমীর তন্দ্রা!
সংগীতের আনন্দের সাথে হও পরিচিত ;

ওগো কাফেলার ঘন্টা,
জেগে ওঠ!"
বক্ষ আমার আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো
. এই বাণীতে,
উৎসাহে-উদ্দীপনায় ফুলে উঠলো
বংশীর মতো ;
আমি জেগে উঠলাম,–
যেমন করে জাগে সংগীত তন্ত্রী থেকে,
নির্মাণ করতে এক ফিরদাউস
মানব-কর্ণের জন্য।
তুলে দিলাম আমি পর্দা
আত্মার রহস্যের,
খুলে দিলাম তার বিস্ময়কর গোপন-তত্ত্ব।
সত্তা ছিলো আমার একটি অসমাপ্ত মূর্তি,
অসুন্দর, মূল্যহীন, অশোভন।
প্রেম করলো আমায় পূর্ণ ঃ
আমি হোলাম মানুষ,
জ্ঞান লাভ করলাম বিশ্ব-প্রকৃতির।
দেখেছি আমি আকাশের স্নায়ুসমূহের গতি,
চন্দ্রের শিরায় প্রবাহিত
শোণিত-ধারা।
কতো রাত্রি ধরে
ক্রন্দন করেছি আমি মানবের জন্য
যেন আমি ছিঁড়ে ফেলতে পারি
জীবন-রহস্যের পর্দা ;
তুলে আনতে পারি জীবনের গঠন-রহস্য
প্রকৃতির বিজ্ঞানাগার থেকে।
আমি সৌন্দর্য বিতরণ করি রাত্রিকে
চন্দ্রের মতো,
আমি শুধু ধূলিকণার মতো ভক্তি-বিনত
সত্য ধর্মের কাছে–
(ইসলামের কাছে),
যে ধর্ম বহু পরিচিত পর্বতে প্রান্তরে,
জ্বালিয়ে দেয় যে মানব-হৃদয়ে
অমর-সংগীতের অগ্নি–
সে বপন করেছিলো একটি ক্ষুদ্র পরমাণু,

তুলে নিয়ে গেলো একটি সূর্য,
ফসল তার শত শত কবি
রুমী-আত্তারের মতো।
আমি একটি দীর্ঘশ্বাস ঃ
উত্থান করবো আমি আকাশের উচ্চতায় ;
আমি ধূম্রমাত্র,
তবু উত্থান আমার
জ্বালাময় অগ্নি থেকে।
উচ্চ চিন্তা দ্বারা ঊর্ধ্বে চালিত হয়ে
লেখনি আমার
প্রকাশ করছে সেই রহস্য,
যা' লুকায়িত ছিলো এই পর্দার অন্তরালে,
যেনো একটি বিন্দু হোতে পারে
সমুদ্রের সমতুল্য,
আর বালু-কণা পরিণত হয় সাহারায়।
কাব্য-সৃষ্টি নয় এ মসনভির লক্ষ্য
এর লক্ষ্য নয় সৌন্দর্য-পূজা
আর প্রেম সৃষ্টি।
ভারতবাসী আমি ;
ফারসী নহে আমার মাতৃভাষা ;
অর্ধচন্দ্রের মতো আমি, পিয়ালা নহে আমার পূর্ণ।
চেয়ো না আমার কাছে ভাব-প্রকাশের যাদু,
আশা করো না আমার কাছে
খানাসার ও ইসফাহান।
যদিও ভারতীয় ভাষা সুমিষ্ট
ইক্ষুর মতো,
তবু সুমিষ্টতর ফারসী ভাষার ভংগি।
সৌন্দর্যে তার অন্তর আমার হোল আবিষ্ট,
লেখনী আমার হোল পল্লবের মতো
জ্বলন্ত কুঞ্জের।
আমার চিন্তাধারার ঐশ্বর্যের জন্য
শুধু ফারসীই হোল এর বাহন।
ওগো পাঠক,
দোষ দিওনা আমার সুরাপাত্র দেখে,
গ্রহণ করো অন্তর দিয়ে
এই সুরার স্বাদ।

প্রথম অধ্যায়

[বিশ্বের গতিধারার মূল উৎস আত্মা। প্রতিটি মানষের জীবনের ধারাবাহিক গতি নির্ভর করে আত্মাকে শক্তিশালী করে তোলার উপরে।]

অস্তিত্বের রূপ হোল আত্মার পরিণাম,
সব কিছুই আত্মার রহস্য–
জাগ্রত হোল যখন আত্মা চৈতন্যে
প্রকাশ করলে সে
চিন্তার বিশ্ব।
নির্যাসে তার শত বিশ্ব লুক্কায়িত ঃ
আত্ম-অনুভূতি আনয়ন করে বে-খুদীকে
প্রকাশ আলোকে।

আত্মা দ্বারা
ধরিত্রীর বুকে রোপিত হয়
বিরোধের বীজ ঃ
অনুভব করে সে তার নিজেকে
অন্যতর রূপে
তার নিজের থেকে।
গঠন করে সে আপনার থেকে
অপরের রূপ
বর্ধন করার জন্য
দ্বন্দ্বের আনন্দ।
এতো হত্যা আপনার বাহু-বলে
যেন সে অনুভব করতে পারে
আপনার শক্তি।
তার আত্ম-প্রবঞ্চনা হোল
জীবনের নির্যাস ;
সে বেঁচে থাকে রক্ত-ধারায় স্নান করে
গোলাবের মতো।
সে ধ্বংস করে শতেক গোলাব-বাগিচা
একটি মাত্র গোলাবের জন্য ;

জাগিয়ে তোলে শতেক আর্ত-বিলাপ
একটি মাত্র সুর সৃষ্টির জন্য।
এত আকাশের জন্য
সে প্রকাশ করে শতেক নবচন্দ্র,
একটি বাণীর জন্য শত শত কথার মালা,
এই অপব্যয় ও নিষ্ঠুরতার কৈফিয়ৎ
রূপ দেওয়া আর পূর্ণ করে তোলা
আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যকে।
শিরীর সৌন্দর্য সমর্থন করে
ফরহাদের যাতনা,
একটি মাত্র মৃগনাভি সমর্থন করে
শতেক কস্তুরী-মৃগের মৃত্যু।
পতংগের ভাগ্য
আত্মবিসর্জন করা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে,
তার এ শাস্তি সমর্থন করে প্রদীপ।

আত্মার তুলি
চিত্রিত করে বর্তমানের শতেক দিবসকে
এগিয়ে আনতে ভবিষ্যতের
একটি মাত্র পূর্বাশা।
অগ্নি তার দগ্ধ করেছে শতেক ইব্রাহিমকে
প্রজ্বলিত করতে মুহাম্মদের একটি প্রদীপ।
কর্তা, কর্ম, কার্য, কারণ–
সব কিছুই রূপ সেই কর্মের উদ্দেশ্যের।
আত্মা হয় জাগ্রত, প্রোজ্বল, পতনশীল,
আবার হয় বিভাময়, জীবন্ত,
সে হয় দগ্ধ আলোময়, চলমান ও উড়ন্ত।
সময়ের বিস্তৃতি তার লীলাক্ষেত্র ;
স্বর্গ তার পথের ধূলি-তরঙ্গ।
তার গোলাব-বাগ থেকে
বিশ্ব হয় গোলাবে ভরপুর ;
রাত্রি জন্ম নেয় তার নিদ্রায়,
দিন জেগে ওঠে তার জাগরণে।
বিভক্ত করেছে সে তার অগ্নিকুণ্ডকে স্ফুলিংগে

আর জ্ঞানকে শিখিয়েছে
বৈশিষ্ট্যের পূজা।
সে ধ্বংস করেছে নিজেকে
আর সৃষ্টি করেছে পরমাণু,
সে বিস্তৃত হয়েছে ক্ষণিকের জন্য
আর সৃষ্টি করেছে বালুকারাশি।
তারপর সে তার ব্যাপ্তিতে হোল ক্লান্ত,
আবার একত্রীভূত হয়ে হোল
পর্বতমালা।
এই হোল আত্মার প্রকৃতি
নিজেকে প্রকাশমান করতে ঃ
প্রতি পরমাণুতে
আত্মার শক্তি রয়েছে তন্দ্রালস।
শক্তি–যা' রয়েছে অপ্রকাশ ও নিস্ক্রিয়
কর্মশক্তিকে করে সুশৃংখল।
বিশ্ব-জীবন যতো বেশী করে আসে
আত্মশক্তি থেকে,
জীবন ততোই এই শক্তির সাথে রাখে সামঞ্জস্য।
একটি জল-বিন্দু যখন লাভ করে আত্মার শিক্ষা
তার অন্তরে,
সে তার মূল্যহীন সত্তাকে করে তোলে একটি মুক্তা।

সুরা রূপহীন,
কারণ 'অহম' তার দুর্বল;
সে তার রূপ পরিগ্রহণ করে
পাত্রের করুণায়।
যদিও সুরাপাত্র গ্রহণ করে রূপ
তবু সে ঋণী আমাদের কাছে
তার গতির জন্য।
পর্বত যখন হারিয়ে ফেলে
তার আপনাকে,
পরিণত হয় সে বালুকায়,
আর অভিযোগ করে যে সমুদ্র স্ফীত হয়ে ওঠে
তার উপরে ;
তরংগ–যতোদিন থাকে সে
সমুদ্র-বক্ষে তরংগ হয়ে,
আরোহী হোতে পারে সমুদ্র-পৃষ্ঠে।

আলোকে গ্রহণ করলে চক্ষুর রূপ
আর দিগ্বিদিক চলতে লাগলো
সৌন্দর্যের সন্ধানে।
তৃণ যখন পেলো তার আত্মার ভিতরে
বর্ধনের শক্তি,
তার আকাংখা বিদীর্ণ করে দিল বাগিচার বুক।
মোমবাতি তার নিজেকে করলে একত্রীভূত
আর গড়ে তুললে তার আপনাকে
পরমাণু থেকে ;
তারপর সে লাগলে গলতে
আর আপনার সত্তা থেকে পলায়ন করতে,
বেয়ে পড়তে লাগলে সে আপনার আঁখি থেকে
অশ্রুর মতো।

যদি অংগুরিয়ের প্রস্তরাধার হোত
স্বভাবতঃই আত্ম-সংরক্ষিত,
ভোগ করত না সে আঘাত ;
কিন্তু যখন শিরোনাম দ্বারা
হয় তার মূল্য নিরূপিত,
স্কন্ধ তার আহত হয় অন্যের নামের বোঝায়।
যেহেতু বিশ্ব রয়েছে দৃঢ়রূপে স্থিত
তার আপন ভিত্তিতে,
বন্দী চন্দ্র চলে তার চারিদিকে
নিরবচ্ছিন্ন গতিতে।
বিশ্ব তাই আপন-ভোলা
সূর্যের আঁখির আলোয়।
রক্তবর্ণ বীচের[১] রঙের মহিমা
নিবদ্ধ করে আমাদের আঁখিযুগ,
পর্বত হয় ঐশ্বর্যশালী
তার গৌরবে ঃ
পরিচ্ছদ তার অগ্নিতে বোনা,
মূল তার একটি আত্ম-প্রত্যয়শীল বীজের মধ্যে।

জীবন যখন শক্তি সঞ্চয় করে
আত্মা থেকে,
জীবন-তটিনী বিস্তার লাভ করে
সমুদ্রের মহত্বে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

[আত্মার জীবন সংগৃহীত হয় আদর্শ গঠন আর তাকে জন্ম দেবার ভেতর থেকে ।]

জীবন সংরক্ষিত হয় উদ্দেশ্য দ্বারা,
কাফেলার বাঁশী বাজে অবিরাম
গন্তব্য পথের সীমানায় পৌঁছবার জন্য।
চাওয়ার মাঝেই মানুষের জীবন,
উৎস-মূল তার লুক্কায়িত আকাংখার ভিতরে।
আকাংখাকে রাখো জীবন্ত করে
তোমার অন্তর-তলে,
পাছে তোমার ক্ষুদ্র ধূলিকণা
পরিণত হয়
সমাধি-মৃত্তিকায়।

এই গন্ধ-ভরা বিশ্বের আত্মাই হোল
অন্তরে আকাংখা,
আকাংখার বাস-ভূমি
লুক্কায়িত প্রতি পদার্থের প্রকৃতিতে।
আকাংখা নৃত্যপর করে তোলে
বক্ষোমধ্যে হৃদয়পিণ্ডকে,
ঔজ্জ্বল্য তার জ্যোতিষ্মান করে তোলে বক্ষকে
দর্পণের মতো।
বিশ্বকে সে দান করে শক্তি
উর্ধ্বমুখে উত্থানের!
মুসার অনুভূতির কাছে
সে হোল খেজুরের মতো!
অন্তর আহরণ করে তার জীবন
এই আকাংখার অগ্নি থেকে,
যখন সে পায় জীবন,
তখনই মৃত্যু হয় সব কিছুর
যা' অসত্য।

যখন তার আকাংখা সৃষ্টিতে

সে হয় বিরত
ভগ্ন হয়ে যায় তার পক্ষ,
করতে পারে না সে উত্থান।
আকাংখা আত্মাকে রাখে চিরজাগ্রত,
সে হচ্ছে অশান্ত-চঞ্চল তরংগ
আত্মার মহাসমুদ্রে।
আকাংখা একটি ফাঁদ
আদর্শকে ধরে রাখবার,
কর্মগ্রন্থকে বেঁধে রাখবার যন্ত্র।
আকাংখা অপলাপ
নির্মম মৃত্যু
জীবন্তের কাছে,
যেমন উত্তাপের অভাব
নির্বাপিত করে অগ্নি-শিখা।

কোথায় আমাদের জাগ্রত চক্ষুর উৎসমুখ?
আমাদের দর্শনের আনন্দ
নিয়েছে দৃশ্যমান রূপ।
তিতির পক্ষীর পদযুগ জন্ম নিয়েছে
তার চলার অপরূপ ভংগি থেকে,
বুলবুলের চঞ্চু তার সংগীতের আনন্দ থেকে।
নল তখনই হয়েছে সুখী,
যখন সে পরিত্যাগ করেছে
তার জন্মভূমি—
নলবন ;
তখনই কারামুক্ত হয়েছে তার সংগীত
যা ছিলো বন্দী।

সেই অন্তরের অন্তঃসার কি—
যে সন্ধান করে ফেরে নব নব আবিষ্কারকে,
উত্থান করতে চায় উর্ধ্বলোকে?
জান তুমি—কোথায় এ রহস্যের কারণ?
সে হোল আকাংখা, সে জীবনকে করে ঐশ্বর্যশালী,
মন তার গর্ভের সন্তান।
সমাজের গঠন, তার রীতি আর
আইন-কানুন কি?

কি এই বিজ্ঞানের অপূর্ব শক্তির রহস্য?

একটি আকাংখা তার নিজের শক্তিতে
হৃদয়ংগম করেছিলো নিজকে,
অন্তর বিদীর্ণ করে বাইরে এসে সে
পরিগ্রহণ করেছিলো রূপ্
নাক, হাত, মস্তিষ্ক, চক্ষু এবং কর্ণ,
চিন্তা, কল্পনা, ভাব, স্মৃতি এবং বোধ,–
সব কিছুই অস্ত্র জীবনের আবিষ্কার
আত্ম-সংরক্ষণের জন্য
তার বিরাম-হীন সংগ্রামে।

বিজ্ঞান ও কলার লক্ষ্য নয় জ্ঞান,
বাগিচার লক্ষ্য নয়
কুঁড়ি আর ফুল!
বিজ্ঞান হোল একটি যন্ত্র আত্মসংরক্ষণের,
বিজ্ঞান একটি পন্থা
আত্মাকে শক্তিশালী করবার্
বিজ্ঞান ও কলা জীবনের ভৃত্য,
যে ভৃত্য জন্ম নিয়েছে ও পালিত হয়েছে
তার আপন গৃহে।

জাগ্রত হও,
ওগো যারা জীবন-রহস্যের কাছে অপরিচিত,
আদর্শের সুরা-রসে প্রমত্ত হয়ে ওঠ জেগে ;
আদর্শ-পূর্বাশার আলোকে সমুজ্জ্বল,
প্রজ্বলিত অগ্নি আল্লাহ্ ব্যতীত সকলের কাছে,
যে আদর্শ স্বর্গের চেয়ে উচ্চতর,
যে জয় করবে, মুগ্ধ করবে, যাদু করবে
মানুষের আত্মাকে ;
প্রাচীন মিথ্যার যে ধ্বংসকারী ;
যে সংক্ষোভে পরিপূর্ণ,
রোজ কেয়ামতের প্রতিরূপ।

বেঁচে আছি আমরা আদর্শ গঠন দ্বারা
উজ্জ্বল হয়ে আছি আমরা
আদর্শের সূর্যালোকে।

তৃতীয় অধ্যায়

[আত্মাকে শক্তিশালী করে তোলে প্রেম]

একটি অতি সূক্ষ্ম আলোক-বিন্দুর নাম আত্মা,
সেই হোল জীবনালোক
আমাদের ধূলিরাশির ভিতরে।

প্রেম দ্বারা হয় সে অধিকতর স্থায়ী,
অধিকতর জীবন্ত, জ্বলন্ত, প্রোজ্বল।
প্রেম থেকে হয় বিচ্ছুরিত
তার অজ্ঞাত সম্ভাবনাকে
দেয় পূর্ণতা।
প্রকৃতি তার সংগ্রহ করে অগ্নি প্রেম থেকে,
প্রেম শিক্ষা দেয় তাকে
বিশ্বকে আলোময় করতে।
প্রেম তরবারি এবং খড়্গকে করে না ভয়,
আব-হাওয়া আর মৃত্তিকা থেকে
নহে তার জন্ম।
প্রেম বিশ্বে আনয়ন করে শান্তি আর সংগ্রাম,
জীবনের উৎস হোল প্রেম,
প্রেমই মৃত্যুর ভয়াল কৃপাণ।
কঠিনতর পর্বত হয় প্রকম্পিত প্রেমের ঔজ্জ্বল্যে,
ঐশ্বরিক প্রেম পরিণত হয় পরিপূর্ণ ঈশ্বরে!

শিক্ষা করো প্রেম আর প্রেমাস্পদের সন্ধান ঃ
সন্ধান কর আঁখি নূহের আর
অন্তর আয়ুবের।
তোমার ধূলি-মুষ্টিতে পরিণত কর সুবর্ণে,
চুম্বন করো এক পরিপূর্ণ মানবের
প্রবেশ-পথ!
প্রজ্বলিত কর তোমার বাতি
রুমীর মতো

আর দগ্ধ কর রুম তাবরিজের অগ্নিতে।[৩]
প্রেমাস্পদ লুক্কায়িত তোমার অন্তরে,
প্রদর্শন করবো আমি তাঁকে তোমার কাছে
যদি থাকে তোমার দর্শনের চক্ষু।
প্রেমিকেরা তাঁর সুন্দরের চাইতে সুন্দরতর,
মধুরতর, সুশ্রীতর, প্রিয়তর।
আত্মা হয় বলশালী তাঁর প্রেম,
ভূমির স্কন্ধ স্পর্শ করে
সপ্তর্ষিমণ্ডলকে।
নজদের ভূমি হয়েছিলো সমুজ্জ্বল
তাঁর গৌরবে,
সে লাভ করলো এক মহোল্লাস
আর উত্থান করলো আকাশের উচ্চতায়।[৪]

মুসলিমের অন্তঃকরণ মুহাম্মদের আবাস,
যত গৌরব আমাদের,
মুহাম্মদের নাম থেকে।
সিনাই তাঁর গৃহের ধূলিরাশির আবর্ত মাত্র,
বাসভূমি তাঁর কাবার কাছেও তীর্থের মতো।
অনন্তকাল তাঁর সময়ের একটি মুহূর্ত মাত্র,
বর্ধিত হয় এ অনন্তকালের আয়ু
তাঁর অন্তঃসার থেকে!
ঘুমিয়েছিলেন তিনি তৃণের আস্তরণে,
কিন্তু লুণ্ঠিত হয়েছিলো খসরুর রাজ মুকুট
তাঁর অনুগামীদের চরণতলে।
তিনি গ্রহণ করলেন হেরা পর্বতের
নৈশ নিস্তব্ধতা
আর গঠন করলেন একটা রাজ্য, আইন
আর শাসক-মণ্ডলী।

কতো রাত্রি তাঁর কেটে গেছে
নিদ্রাহীন চোখে,
যেন ঘুমাতে পারে মুসলিম পারস্য-সিংহাসনে।
যুদ্ধক্ষেত্রে লৌহ যেতো গলে
তাঁর তরবারির চমকে,
আর নামাযের সময়ে অশ্রু ঝরতো তাঁর চোখে

বৃষ্টিধারার মতো।
প্রার্থনা করতেন যখন তিনি আল্লার সাহায্য,
তরবারি তার জওয়াব দিত–'আমীন',
আর ধসে যেতো কতো রাজবংশ।
আনলেন তিনি নবতর কানুন এই বিশ্বে।

প্রাচীন সাম্রাজ্যরাজিকে আনলেন তিনি
সমাপ্তির দিকে।
দ্বার উদঘাটন করলেন তিনি নবীন বিশ্বের
ধর্মের কুঞ্চিকা দ্বারা ঃ
বিশ্ব-গর্ভে কোনদিন জন্ম নেয়নি
তাঁর মতো মহামানুষ।
দৃষ্টিতে তাঁর উচ্চনীচ ছিলো সমান,
বসতেন তিনি আহারে তাঁর ভৃত্যের সাথে
এক বিছানায়।

তায়ী আমীর-কন্যা' হোল বন্দী
সমর-ক্ষেত্রে
আর আনীত হোল মহাপুরুষের সম্মুখে
চরণ যুগল তার শৃংখলাবদ্ধ, দেহ অনাবৃত,
লজ্জায় শির অবনত।
মহান নবী যখন দেখলেন তাকে অনাবৃত,
ঢেকে দিলেন তার মুখমণ্ডল
আপনার আচ্ছাদন দ্বারা।

আমরা অধিকতর উলংগ
তায়ী আমীর-কুমারীর চেয়ে,
অনাবৃত আমরা বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে।
ঈমান আমাদের তাঁরই উপর
রোজ কেয়ামতের দিনে,
এই বিশ্বেও শুধু তিনি আমাদের রক্ষক।
তাঁর অনুগ্রহ আর গজব
উভয়ই হচ্ছে করুণা ঃ
একটা হচ্ছে করুণা বন্ধুদের উপর,
অপর শত্রুর প্রতি।
খুলেছিলেন তিনি করুণার দ্বার

দুশমনের কাছে,
মক্কায় প্রচার করেছিলেন বাণী ঃ
"কোন প্রতিশোধ নেওয়া হবে না
তোমাদের উপর।"

আমরা যারা জানিনা দেশের বন্ধন
আছি দৃষ্টির মতো এক
যদিও আলোক আসে তাঁর দু'চোখ থেকে
বাস করি আমরা হেজাজ, চীন ও পারস্যে ঃ
তবু আমরা শিশির-বিন্দুচয়
এক হাস্যোজ্জ্বল ঊষার।
মেনে চলি আমরা নির্দেশ সেই মক্কার সাকীর
একীভূত আমরা সুরারস আর পিয়ালার মতো।
দগ্ধ করেছিলেন তিনি নির্মম দাহনে
যত আভিজাত্যের বিভেদ
অগ্নি তাঁর গ্রাস করেছিলো যতো মিথ্যা আর জঞ্জাল।
অসংখ্য দলবিশিষ্ট আমরা
গোলাবের মতো
কিন্তু খোশবু তার এক।

আত্মা তিনি এই সমাজের,
অদ্বিতীয় তিনি!
আমরা ছিলাম তাঁর অন্তরের গোপন রহস্য ঃ
বাণী প্রচার করলেন তিনি নির্ভয়ে,
আর আমরা হোলাম অবতীর্ণ।
তার প্রেমের গীতি পরিপূর্ণ করেছে আমার নিঃশব্দ বংশী,
বক্ষে আমার আছড়ে পড়ে
শতেক সংগীত-সুর।

কি করে বলবো আমি
কি প্রেম জাগ্রত করেছিলেন তিনি?
শুষ্ক কাষ্ঠরাশি ক্রন্দন করেছিলো
তাঁর বিদায়ে।
গৌরব তাঁর প্রকাশ লাভ করে
মুসলিমের সত্তায়।
কত সিনাই জাগ্রত হয়
তাঁর পথের ধূলা থেকে।

আমার মূর্তি জন্ম নিয়েছিলো
তাঁর দর্পণে,
আমার ঊষা জেগে উঠেছিলো
তাঁর বক্ষের সূর্য থেকে।
বিশ্রাম আমার অশান্ত-চঞ্চল,
গোধূলি আমার উষ্ণতর
রোজ-ক্বিয়ামতের প্রভাতের চেয়ে,
বসন্ত-মেঘ তিনি, আর আমি তাঁর বাগিচা,
আঙ্গুর-কুঞ্জ আমার শিশির-সিক্ত হয়
তাঁর বর্ষণে।

আমি বপন করেছিলাম আমার আঁখি
প্রেমের ক্ষেত্রে,
আর তুলে নিয়েছি কল্পনার ফসল।
"মদীনা-ভূমি মিষ্টতর উভয় বিশ্বের চেয়ে,
আহা, সুখময় সেই নগরী
যেখানে আবাস সেই প্রেমাস্পদের।"
মোল্লা জামীর বর্ণনা-ভংগিতে
আত্মহারা আমি ;
তাঁর কাব্য ও সাহিত্য আমার অপূর্ণতার প্রতিষেধক।
তিনি লিখেছিলেন কাব্য
অপরূপ ধারায়
আর গেঁথেছিলেন মুক্তা-মালা
প্রভুর গুণ-কীর্তনের,
"মুহাম্মদ হচ্ছেন ভূমিকা বিশ্ব-গ্রন্থের ;
সারা বিশ্ব হচ্ছে দাস আর তিনি তার প্রভু।"

প্রেমের সুরারস থেকে জন্ম নেয়
কতো আধ্যাত্মিক গুণরাজি ঃ
অন্ধ অনুরাগ হচ্ছে প্রেমের অন্যতম লক্ষণ।
বোস্তামের ঋষি বায়েজিদ,
যিনি ভক্তিতে ছিলেন অদ্বিতীয়,
পরিত্যাগ করেছিলেন তরমুজ।[৬]
আশেক হও অনুক্ষণ তোমার মাশুকের অনুরাগে,
যেন তুমি সঞ্চালন করতে পার পক্ষ
পৌঁছতে আল্লার নৈকট্য।

পরিভ্রমণ কর মুহূর্তের জন্য
অন্তরের হেরা প্রদেশে,
পরিত্যাগ করো নিজকে, ছুটে যাও আল্লার পথে।
বলশালী হয়ে আল্লাহ্‌ দ্বারা
প্রত্যাবর্তন করো আত্মার দিকে,
ভেঙে দাও ইন্দ্রিয়পরতার লাত ও ওজ্জার মস্তক।
চালনা কর এক বাহিনী
প্রেমের শক্তিতে,
অবতীর্ণ কর তোমার আপনাকে
প্রেমের ফারান পর্বতে ;
যেন কাবার প্রভু প্রদর্শন করেন
তোমায় অনুগ্রহ–
আর গড়ে তোলেন তোমায় এই বাণীর প্রতিমূর্তি করে,
"ওগো, প্রেরণ করবো এক প্রতিনিধি
বিশ্বের বুকে।"[১]

চতুর্থ অধ্যায়

[আত্মা দুর্বল হয়ে পড়ে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা]

ওগো যারা কর গ্রহণ করতে সিংহের কাছ থেকে,
তোমাদের প্রয়োজন
তোমাদেরকে পরিণত করেছে শৃগালে।
বেদনা-সংগীত তোমার দারিদ্রের ফল ঃ
এই ব্যাধি তোমার ব্যথার উৎসমুখ।
তাতে বিনষ্ট করে তোমাদের সম্মানের উচ্চ ধারণা,
আর নিভিয়ে দেয় তোমাদের
মহান কল্পনার আলোকে।
পান কর গোলাবী সুরারস
অস্তিত্বের সোরাহী থেকে!
ছিনিয়ে নাও কালের ভাণ্ডার থেকে অর্থ!
নেমে এসো উষ্ট্র-পৃষ্ঠ থেকে
ওমরের মতো!
সাবধান, ঋণী হয়ো না কারুর কাছে?
আর কতকাল তুমি আকাংখা করবে দাসত্ব
আর চাইবে শিশুর মতো আরোহণ করতে
নলের উপর?
যে প্রকৃতি নিবদ্ধ রাখে তার দৃষ্টি আকাশের দিকে,
হয়ে পড়ে হীনতর
দান গ্রহণের দ্বারা।
দারিদ্র গ্রহণ করে উৎকট আকার
ভিক্ষাবৃত্তিতে ;
ভিক্ষায় ভিক্ষুককে করে তোলে দরিদ্রতর।
ভিক্ষা অবনমিত করে আত্মাকে
আর বঞ্চিত করে আত্মার সিনাইকে
আলোক থেকে।
ছাড়িয়ে দিও না তোমার ধূলিমুষ্টিকে,
সংগ্রহ করো অন্ন তোমার আত্মশক্তিবলে
চন্দ্রের মতো!
যদিও দরিদ্র হতভাগ্য তুমি

আর অভাবের যাতনায় বিশৃঙ্খল,
তবু কামনা কোর না তোমার দিনের অন্ন
অপরের অনুগ্রহ থেকে,
চেয়ো না জল সূর্যের ঝর্ণা থেকে,
পাছে তুমি পতিত হও লজ্জায়
মহানবীর সম্মুখে
রোজকিয়ামতের দিনে,
যেদিন প্রত্যেক আত্মা হবে ভয়ে প্রকম্পিত।
চন্দ্র সংগ্রহ করে তার উপজীবিকা
সূর্যের ভাণ্ডার থেকে
আর বহন করে তার অনুগ্রহের দাগ
আপনার বুকে।

প্রার্থনা কর সাহস আল্লার দরবারে!
দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর সৌভাগ্যের সাথে!
পবিত্র ধর্মের গৌরবকে কোর না ক্ষুণ্ন!
যিনি মূর্তির আবর্জনা দূর করেছিলেন কাবা থেকে,
বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ প্রেম করেন সেই লোককে,
যে উপার্জন করে তার আপন জীবিকা।
ধিক তাকে যে অনুগ্রহ ভিক্ষা করে
অপরের কাছে,
অবনত করে তার শির অন্যের করুণায়!

গ্রাস করেছে সে তার আপনাকে
অপরের প্রদত্ত অনুগ্রহের অগ্নিতে,
আত্মসম্মান বিক্রয় করেছে সে
এক কপর্দকের বিনিময়ে।
সুখী সে,
যে রৌদ্রতাপ-দগ্ধ হয়েও খেজরের কাছে কামনা করে না
এক পিয়ালা আবে-হায়াত!
ভিক্ষাবৃত্তির লজ্জায় ভ্রূযুগ নহে তার সিক্ত ঃ
তখনো সে পূর্ণ মানুষ,
শুধু মৃত্তিকা-খণ্ড নহে।
সেই মহান তারুণ্য বিচরণ করে আকাশের নীচে
মাথা উঁচু করে
পাইন বৃক্ষের মতো।

হস্ত তার রিক্ত?
সে-ই সব চাইতে বেশী প্রভুত্ব-সম্পন্ন
আত্মার উপর।
হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তার ঐশ্বর্য?
অধিকতর সাবধান সে।
ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা যদি অর্জন কর
একটি মহাসমুদ্র,
তা শুধু অনল সমুদ্রই ;
মধুরতর একটি ক্ষুদ্র শিশির-বিন্দু-
যদি অর্জিত হয় স্বহস্তে।
সম্মানিত মানুষ হও,
জলবুদ্বুদের মতো
রাখো তোমার পিয়ালা উলটে
সমুদ্রের মাঝেও।

পঞ্চম অধ্যায়

[আত্মা যখন শক্তি সংগ্রহ করে প্রেম থেকে, সে প্রভুত্ব করতে পারে বিশ্বের ভিতর ও বাইরের সব শক্তির উপরে ।]

যখন আত্মাকে বলশালী করে তোলা যায়
প্রেম দ্বারা,
শক্তি তার শাসন করে বিরাট বিশ্ব ।

সেই স্বর্গীয় ঋষি যিনি সাজিয়েছিলেন আকাশকে,
তারার মালায়
আহরণ করেছিলেন এই সব কুঁড়ি
আত্মার শাখা থেকে ।
হস্ত তার হয়ে উঠে ঐশী হস্ত,
অঙ্গুলি-ইশারায় তাঁর দ্বিখণ্ডিত হয় চন্দ্র ।
শান্তি-স্থাপনকারী সে এ বিশ্বের সকল বিরোধের মাঝে,
আজ্ঞা তার পালন করে
জামশিদ ও ডারিয়াস ।
আমি বলবো তোমায় বু-আলীর কাহিনী,[৮]
নাম যাঁর বহুবিখ্যাত
সারা ভারতের বুকে ;
প্রাচীন গোলাব-বাগিচার সংগীত শুনিয়েছিলেন যিনি,
বলেছিলেন যিনি মুগ্ধকর গোলাবের কাহিনী ।
তাঁর চঞ্চল খির্কার হাওয়ায়
গড়েছিলেন তিনি ফিরদাউস
এই অনলোদ্ভূত দেশে!
একদিন তরুণ শিষ্য তাঁর চলেছে বাজারের পথে,
বু-আলীর বাণীর সুরারসে
প্রমত্ত তার শির ।
নগরের শাসনকর্তা চলেছে পথে
অশ্বপৃষ্ঠে,
চারিপাশে তার ভৃত্য ও অনুচরবৃন্দ ।
পূরোবর্তী অনুচর বললে চীৎকার করে ঃ

“ওগো বে-খেয়াল পথিকদল,
এসো না কেউ শাসনকর্তার চলার পথে!”
দরবেশ তখন করছে পাদবিক্ষেপ
অবনত মস্তকে,
নিমজ্জমান তার আপন চিন্তার সমুদ্রে।
অহংকার-মত্ত দণ্ডবাহক
ভেঙে দিলে তার দণ্ড দরবেশের মস্তকে,
আর দরবেশ ছেড়ে চললে শাসনকর্তার পথ,
বিমর্ষ, দুঃখপীড়িত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।
হাজির হোল সে বু-আলীর কাছে,
জানলো তাঁর কাছে অভিযোগ,
ঝরে পড়লো অশ্রুধারা তাঁর আঁখিযুগ থেকে।
শেখের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো
অগ্নিময় বাণী
পর্বতোপরি বিদ্যুৎ-চমকের মতো।
আত্মা তাঁর উদগীরণ করলে এক অদ্ভুত অনল-জ্বালা,
আদেশ করলেন তিনি তাঁর অনুচরকে ঃ
লেখনী ধারণ করে লিখে দাও এক পত্র
সুলতানের কাছে দরবেশের কাছ থেকে।
বলো,–‘তোমার শাসনকর্তা ভেঙেছে
আমার সেবকের শির ;
নিক্ষেপ করেছে সে জ্বলন্ত অনল
তার আপনার জীবনে।
গেরেফতার করো এই দুর্মতি শাসককে,
নতুবা প্রদান করবো আমি তোমার রাজ্য
অপরের হাতে।’
আল্লার প্রিয় দরবেশের পত্র
সুলতানের প্রতি অংগ-প্রত্যংগ করলে
প্রকম্পিত।
দেহ তার পরিপূর্ণ হোল জ্বালায়,
হোলেন তিনি বিমর্ষ-ম্লান
সন্ধ্যা-রবির মতো।
প্রেরণ করলেন তিনি হাত-কড়ি,
সেই শাসনকর্তার জন্য,
আর অনুরোধ করলেন বু-আলীকে
ক্ষমা করতে এই গোস্তাখী।

খোশ-এলহান কবি খসরু-
সুরা যাঁর উত্থিত হোত
সৃষ্টি-প্রতিভাশালী অন্তর থেকে,
আর যাঁর প্রতিভা ছিলো চন্দ্রালোকের মৃদু ঔজ্জ্বল্যে পরিপূর্ণ,
নিযুক্ত হোলেন রাজদূত।
হাজির হোলেন যখন তিনি বু-আলীর সম্মুখে
আর বাজালেন তাঁর বীণা,
তাঁর সংগীত বিগলিত করলো ফকিরের অন্তর
কাঁচের মতো।
কাব্যের একটি মাত্র সুরের রেশ
বয়ে আনলো একটা রাজত্বের মহিমা,
যা ছিলো পর্বতের মতো স্থির।
দরবেশদের অন্তর কোর না আহত,
নিক্ষেপ কোর না তোমার নিজকে
জ্বলন্ত অনল-কুণ্ডে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

[একটি কাহিনী। এর সারমর্ম হচ্ছে–আত্ম-অস্বীকারের মতবাদ প্রচারিত হয়েছিলো মানবের শাসিত সম্প্রদায়ের দ্বারা। উদ্দেশ্য ছিলো–তাদের শাসক সম্প্রদায়ের স্বভাবে দুর্বলতা আনয়ন করা।]

শুনেছো তোমরা সেই প্রাচীনকালের কথা?
এক দল মেষ থাকতো কোনো চারণভূমিতে,
বর্ধিত হয়েছিলো তারা সংখ্যায়,
ভয় ছিলো না তাদের দুশমনের জন্য।
ভাগ্যের বিড়ম্বনা,
বক্ষ তাদের বিদীর্ণ হোল
দুর্যোগের আঘাতে।
বন থেকে এলো এক দল ব্যাঘ্র,
ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা
মেষ-পালকের উপরে।
দেশজয় আর অধিকার স্থাপন শক্তির নিদর্শন,
বিজয় হোল প্রকাশ
সেই শক্তির।
প্রভুত্বের ভেরী বাজালো হিংস্র ব্যাঘ্রের দল,
বঞ্চিত করলো তারা মেষ দলকে
তাদের স্বাধীনতা থেকে।
ব্যাঘ্রেরা যতো সংগ্রহ করতে লাগলো তাদের শিকার,
ময়দান ততো রক্তিম হোতে লাগলো
মেষের শোণিতে।
একটি মেষ,–
চালাক এবং সুচতুর সে,
চয়োবৃদ্ধ, ধূর্ত–
নেকড়ের মতো ;
জ্ঞাতি বন্ধুদের দুর্ভাগ্যে ব্যথিত হোল সে,
বিরক্ত হোল ব্যাঘ্রদের নির্মমতায়,
অভিযোগ করলো সে অদৃষ্টচক্রের জন্য,
ফিরিয়ে আনতে চাইলো কৌশলে
তার জাতির সৌভাগ্য।

দুর্বল যারা,
তারা আত্মসংরক্ষণের জন্য
উপায় উদ্ভাবন করে
সুনিপুণ বুদ্ধি দ্বারা।
দাসত্বের অনিষ্ট হোতে রক্ষা পাবার জন্য
উপায় উদ্ভাবনের ক্ষমতা হয় দ্রুত,
আর যখন প্রতিশোধের উন্মত্ততা
হয়ে উঠে প্রকট ;
দাসত্ব-পীড়িতের মত যখন
চিন্তা করে বিদ্রোহের।
"বন্ধন আমাদের দুচ্ছেদ্য,"—
বললে সে আপন মনে,
"কিনারা নেই আমাদের দুঃখ-সমুদ্রের।
শক্তিতে পারি না আমরা রক্ষা পেতে
ব্যাঘ্রের হস্ত থেকে ঃ
পদযুগ আমাদের রজত-সম ;
নখর তাহার লৌহের সমতুল।
সম্ভব নহে তা' কিছুতেই,
যতোই চলুক উপদেশ আর যন্ত্রণা,
অসম্ভব সৃষ্টি করা নেকড়ের স্বভাব
মেষের ভিতরে।
কিন্তু সেই হিংস্র ব্যাঘ্রকে মেষে পরিণত করা—
তা' হবে সম্ভব ;
উদাসীন করা তাকে তার স্বভাবে—
তা'ও সম্ভব হবে।"
সে সাজলো পয়গাম্বর
প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত,
প্রচার করতে লাগলো সে
রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের কাছে।
বললে সে চীৎকার করে ঃ
"ওগো উদ্ধত মিথ্যাবাদীর দল,
যারা চিন্তা করো না সেই দুর্ভাগ্যের দিন
যা' হবে চিরন্তন!
অধিকারী আমি ঐশী শক্তির,
নবী আমি আল্লার প্রেরিত
ব্যাঘ্রের জন্য।

আমি এসেছি আলোক হয়ে
অন্ধ আঁখির জন্য,
এসেছি আমি আইন স্থাপন করতে
আর জারী করতে আদেশ।
অনুতপ্ত হও তোমাদের নিন্দনীয় কার্যের জন্য!
ওগো দুষ্ট ষড়যন্ত্রকারীর দল,
মনোযোগী হও নিজকে সৎপথে পরিচালিত করতে!
হিংস্র এবং শক্তিশালী যে,
শোচনীয় তার অবস্থা ঃ
জীবনের সাফল্য আত্ম-অস্বীকারে।
ধর্মের সার তৃণভোজনে ঃ
তৃণ-ভোজীরা প্রিয় আল্লার কাছে।
তোমাদের দন্তের তীক্ষ্ণতা আনে অমর্যাদা
তোমাদের জীবনে ;
করে তোমাদের অনুভুতির আঁখিকে অন্ধ।

শুধু দুর্বলের জন্যই আছে ফিরদাউস,
শক্তিই হোল ধ্বংসের পন্থা।
বৃহত্ত্ব এবং সম্মানের লোভই হোল দুর্মতি,
দারিদ্র মিষ্টতর রাজত্বের চেয়ে ;
বিদ্যুৎ-চমকের ভয় রাখে না শস্যবীজ ;
বীজ যদি হয়ে পড়ে রাশিকৃত,
নির্বোধ সে।
যদিও তুমি হও সচেতন,
তুমি হবে বালু-মুষ্টি, সাহারা নয়,
যেনো তুমি উপভোগ করতে পার
সূর্য-রশ্মি।
ওগো, যারা আনন্দ পাও মেষ-হত্যায়,
হত্যা করো নিজেকে,
যেনো তুমি পেতে পার সম্মান।
জীবন হয়ে যায় অস্তিত্বহীন
হিংসা, অত্যাচার, প্রতিহিংসা
আর শক্তি প্রদর্শন দ্বারা।
যদিও পদদলিত,
তবু তৃণ জেগে উঠে অনন্তকাল ধরে
আর ধুয়ে দেয় মৃত্যুর নিদ্রা

তার আঁখি থেকে
বারংবার।

ভুলে যাও আপনাকে,
যদি তুমি হও জ্ঞানী!
যদি তুমি বিস্মৃত না হও আপনাকে,
উন্মাদ তুমি।
নিমিলিত করো তোমার আঁখি,
বন্ধ করো তোমার কর্ণ, বন্ধ করো তোমার মুখ,
যেনো তোমার চিন্তাধারা উত্থিত হয়
আকাশের উচ্চতায়!
পৃথিবীর এই বিস্তৃত বিচরণ-ক্ষেত্র
কিছু নয়, কিছু নয়,-
ওগো নির্বোধ, উৎপীড়িত করো না নিজেকে
একটা অপচ্ছায়ার জন্য!"

ব্যাঘ্রজাতির ক্লান্তি এসেছিলো
কঠোর দ্বন্দ্বে,
তারা ভাসিয়ে দিয়েছিলো আপনাদেরকে
বিলাসের আনন্দে।
এই নিদ্রাকর উপদেশ-বাণী
তুষ্ট করলো তাদেরকে,
নির্বুদ্ধিতায় তারা গ্রাস করলো
মেষের যাদু।
যারা শিকার করতো মেষ,
এবার গ্রহণ করলো মেষের ধর্ম।
ব্যাঘ্রজাতি সুরু করলো তৃণাহার ঃ
অবশেষে ভেঙে গেলো তাদের
ব্যাঘ্রের প্রকৃতি।
তৃণ ভোজন ভোঁতা করে দিলো তাদের দন্ত,
নির্বাপিত করলো তাদের চোখের ঔজ্জ্বল্য,
সাহস অন্তর্হিত হোল ক্রমে তাদের বক্ষ থেকে,
আলোক দূর হোল
দর্পণ থেকে।
থাকলো না তাদের অতি পরিশ্রমের প্রমত্ততা,
কর্মের আকাংখা আর থাকলো না

তাদের অন্তরে।
হারিয়ে ফেললো তারা
          শাসন-ক্ষমতা আর স্বাধীনতার সংকল্প ;
হারালো তারা খ্যাতি, সম্মান আর সৌভাগ্য!
তাদের নখর–যা ছিলো লৌহ-সমুতল–
                    হোল শক্তিহীন ;
তাদের আত্মার হোল মৃত্যু
          আর দেহ হোল তাদের সমাধি-মৃত্তিকা।
দৈহিক শক্তি হোল হ্রাস,
          যখন আধ্যাত্মিক ভয় হোল বর্ধিত ঃ
আধ্যাত্মিক ভয় হরণ করলো তাদের সাহস।

সাহসের অভাব জন্মালো শতের ব্যাধি–
          দারিদ্র, ভীরুতা, নীচবৃত্তি।
জাগ্রত ব্যাঘ্র মেষের যাদুতে হোল
তন্দ্রাবিভূত,
          এই অধঃপতনেরই নামকরণ করলে সে
                    নৈতিক শিক্ষা।

সপ্তম অধ্যায়

[প্লেটো–যাঁর চিন্তাধারা গভীরভাবে প্রভবান্বিত করেছে ইসলামের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা ও সাহিত্যকে–মেনে চলতেন মেয়ের ধর্ম। আমাদেরকে আত্মসংরক্ষণ করতে হবে তাঁর প্রচারিত শিক্ষার বিরুদ্ধে।][১]

প্লেটো–সংসার-বিরাগী ঋষিশ্রেষ্ঠ,
ছিলেন সেই প্রাচীন মেষপালের অন্যতম।
তাঁর পেগেসাস পথ হারিয়েছিলো!
ভাববাদিতার অন্ধকারে ;
আর পাদুকা নিক্ষেপ করেছিলো
বাস্তবের গিরিশিখরে।
অদৃশ্য করেছিলো তাঁকে মায়ামুগ্ধ,
হস্ত, চক্ষু, কর্ণের ছিলো না কোনো গুরুত্ব
তাঁর কাছে।

"মৃত্যু"–তিনি বলতেন,–"জীবনের গোপন রহস্য ;
প্রদীপ গৌরবান্বিত হয় নির্বাপিত হয়ে।"
তিনি দুর্বল করে দিয়েছেন আমাদের চিন্তাধারা,
পিয়ালা তাঁর নিদ্রাবিভূত করে আমাদেরকে
আর সরিয়ে নেয় আমাদের কাছ থেকে
দৃশ্যমান বিশ্ব।
উচ্চ চিন্তাধারা নিয়ে তিনি উত্থিত হয়েছিলেন
উচ্চতম আকাশ-লোকে
আর বলতেন এই প্রকৃতির বিশ্বকে
একটি উপকথা।
কাজ ছিলো তার ভেঙে দেওয়া জীবনের প্রাসাদ
আর খণ্ডিত করা জীবন বৃক্ষের
শাখা-সমূহ।
প্লেটোর চিন্তাধারা ক্ষতিকে মনে করতো লাভ ;
দর্শন তাঁর সত্তাকে প্রচার করেছিলো
অসত্তা বলে।
প্রকৃতি তার এনেছিলো তন্দ্রা

আর সৃষ্টি করেছিলো স্বপ্ন
অন্তশ্চক্ষু না তাঁর সৃষ্টি করেছিলো মৃগতৃষ্ণিকা।

ছিলো না তাঁর কর্ম-স্পৃহা,
আত্মা তাঁর আনন্দ লাভ করতো
অনস্তিত্বকে নিয়ে।
তিনি অবিশ্বাস করতেন এই বাস্তব বিশ্বকে,
হয়েছিলেন স্রষ্টা অদৃশ্য কল্পনারাজির।

মধুর এই দৃশ্যমান জগত
জীবন্ত আত্মার কাছে,
প্রিয় সেই কল্প-জগৎ মৃত আত্মার কাছে ;
তাঁর মৃগের নেই মহিমা চলার গতিভংগীর,
তিতির তাঁর পায়না বিলাস-ভ্রমণের আনন্দ।
তাঁর শিশির-বিন্দুরা পারে না দুলতে,
তাঁর পাখীদের বক্ষে নেই শ্বাস-প্রশ্বাস,
বীজ তাঁর চায় না বর্ধিত হোতে।
পতংগ তাঁর জানে না পক্ষ সঞ্চালন করতে।
সন্ন্যাসীর আমাদের পলায়ন ছাড়া ছিলো না উপায় ;
বিশ্বের কল-কোলাহল
পারতেন না তিনি সহ্য করতে।
তিনি তাঁর আত্মাকে স্থাপন করেছিলেন
নির্বাপিত অনল-কণায়,
আর অংকিত করেছিলেন একটি বিশ্ব
অহিফেন-তন্দ্রাবিভূত।
তিনি পক্ষ বিস্তার করেছিলেন আকাশের উদ্দেশ্যে,
আর ফিরে এলেন না তাঁর নীড়ে।
কল্পনা তাঁর নিমজ্জিত ছিলো স্বর্গের সোরাহীতে,
জানি না তা' সেই সুরাপাত্রের ময়লা,
না তার নীচের ইষ্টক।
মানব-জাতি বিষদুষ্ট হয়েছিলো
তাঁর নেশায় ঃ
তিনি ছিলেন তন্দ্রাতুর,
আনন্দ পেতেন না কোন কর্মে।

অষ্টম অধ্যায়

[কাব্যের সত্যিকার প্রকৃতি ও ইসলামী সাহিত্যের সংস্কার সম্বন্ধে।]

আকাংখা মানব-দেহে প্রবাহিত করে উত্তপ্ত শোণিত,
আকাংখার প্রদীপে প্রজ্বলিত হয়
এই ধূলি-কণা।
আকাংখা দ্বারা জীবনের পিয়ালা পূর্ণ হয়
সুরা-রসে কানায় কানায়,
যেনো জীবন চঞ্চল হয়ে উঠে,
চলমান হয়ে উঠে চপলগতিতে।
জীবন পূর্ণ হয়ে উঠে শুধু বিজয়ে,
আর বিজয়ের আকর্ষণ হোল আকাংখায়।
জীবন হোল শিকারী আর আকাংখা তার ফাঁদ,
আকাংখা প্রেমের সুসংবাদ
সুন্দরের কাছে।
কি কারণে আকাংখা জাগিয়ে তোলে
জীবন-গীতির সংগীত-রাগ ?
যা' কিছু শ্রেয়, যা' কিছু মনোরম, যা' কিছু সুন্দর,
তাই আমাদের পথ-প্রদর্শক
আকাংখার গহন অরণ্যে।
মূর্তি তার অংকিত হয় তোমার অন্তরে,
সৃষ্টি করে তোলে আকাংখা
তোমার অন্তর-তলে।
সুন্দর হোল আকাংখা ভরা জোয়ারের স্রষ্টা,
আকাংখা লালিত হয়
সৌন্দর্য-প্রকাশে।
সৌন্দর্য অবগুণ্ঠন-মুক্ত হয় কবির অন্তরে,
সৌন্দর্যের জ্যোতি ঃ বিচ্ছুরিত হয়
তার সিনাই থেকে।
দৃষ্টিতে তার সুন্দর হয়ে উঠে সুন্দরতর,
প্রকৃতি প্রিয়তর হয়
তার যাদুতে।

বুলবুল শিখেছে তার সংগীত তার মুখ থেকে,
রঙে তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে
গোলাবের গণ্ডদেশ।
অনুরাগ তার দগ্ধ করে পতংগের অন্তর,
সে-ই তো লাগিয়ে দেয় উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা
প্রেম-কাহিনীতে।
সমুদ্র ও পৃথিবী আছে লুক্কায়িত[১০]
তার জল ও কর্দমে,
শতেক নবীন বিশ্ব আছে লুক্কায়িত তার অন্তরে।
যখন প্রস্ফুটিত হয়নি তার মস্তিষ্কে কুসুম-রাজি,
শ্রুত হয়নি কোনো আনন্দ বা ব্যাথার সংগীত।
সংগীত তার এনে দেয় এক অপূর্ব সম্মোহন
আমাদের উপর,
লেখনী তার টেনে আনে পর্বতকে একটিমাত্র চুলের সাথে।
চিন্তাধারা তার বিরাজ করে
চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির সাথে,
সে সৃষ্টি করে সৌন্দর্য আর জানে না
কুৎসিত কি।
সে একজন খেজর[১১]
অন্ধকারের ভেতরে আছে তার
আবে-হায়াত ঃ
অশ্রুতে তার আরো জীবন্ত করে তোলে
অস্তিত্বশীল পদার্থকে।
ধীরে পদক্ষেপে চলি আমরা অনভিজ্ঞ নবিসের মতো,
হোঁচট খেতে গন্তব্য পথের উপর।
বুলবুল তার বাজিয়েছে একটি সুর
আর পেতেছে মন্ত্রণাজাল আমাদেরকে প্রতারিত করতে
যেনো সে চালিত করতে পারে আমাদেরকে
জীবনের ফিরদাউস-ভূমিতে,
আর যেনো জীবনের ধনুক হোতে পারে
একটি পূর্ণ চক্র।
কাফেলা অগ্রসর হয় তার ঘণ্টাধ্বনিতে
আর অনুসরণ করে তার বংশীর আওয়াজ,
যখন তার মন্দবায়ু প্রবাহিত হয় আমাদের বাগিচার উপর দিয়ে,
প্রবিষ্ট হয় তা' গুল্ম ও গোলাবরাজির বুকে
ধীরে সন্তর্পণে।

তার যাদুমন্ত্র জীবনকে করে তোলে আত্ম-বর্ধিষ্ণু,
সে হয়ে উঠে আত্মজিজ্ঞাসু ও চঞ্চল।
সে সারা বিশ্বকে করে নিমন্ত্রণ
তার জিয়াফতে ;
সে অপব্যয় করে তার অগ্নি,
যেনো তা' সুলভ বাতাসের মতো।
ধিক সেই সব জাতিকে,
যারা আত্মসমর্পণ করে মৃত্যুর কাছে,
আর যাদের কবি তাদেরকে সরিয়ে নেয়
জীবনের আনন্দ থেকে।
দর্পণ তার প্রকাশ করে সৌন্দর্যকে
কুৎসিতরূপে,
মকরন্দ তার দিয়ে যায় শতেক দংশন
অন্তরের মাঝে।
চুম্বন তার বিনষ্ট করে গোলাবের সজীবতা,
বুলবুলের অন্তর থেকে সে ছিনিয়ে নেয়
উড়ে বেড়ানোর আনন্দ।
স্নায়ু তোমার দুর্বল হয়ে আসে
তার অহিফেন নেশায় ;
তোমার জীবনের বিনিময়ে
দেও তুমি তার সংগীতের মূল্য।
সে আনন্দের সাইপ্রেস বৃক্ষকে করে
শ্যেনপক্ষীকে।
মৎস্য সে,
বক্ষ থেকে উপর তার মানবাকৃতি,
সমুদ্র-বিলাসিনী নারীর মতো।
সংগীতে সে যাদু করে নাবিককে,
আর টেনে নেয় তরুণী
সমুদ্রের তলদেশে।
দুঃখ-সংগীত তার হরণ করে দৃঢ়তা
তোমার বুক থেকে,
যাদুমন্ত্র তার জানিয়ে দেয় তোমায়,
মৃত্যুই জীবন।
তোমার অন্তর থেকে সে হরণ করে নেয়
অস্তিত্বের আকাংখা,
বাহির করে নেয় অত্যুজ্জ্বল 'লাল'

তোমার খনি থেকে।
লাভকে সে সজ্জিত করে ক্ষতির পরিচ্ছদে
প্রশংসাভাজনকে করে তোলে সে নিন্দনীয়।
নিমজ্জিত করে সে তোমায় চিন্তার সমুদ্রে,
সরিয়ে দেয় তোমায় কর্ম থেকে দূরে।
পীড়িত সে,
কথায় তার বর্ধিত হয় আমাদের পীড়া ঃ
যতোবার তার পিয়ালা আসে ঘুরে,
পীড়াগ্রস্ত হয় সব পানকারীরা।
বসন্তে তার নেই কোনো বিদ্যুৎচমক, আর বৃষ্টি,
বাগিচা তার বর্ণ ও গন্ধের মরীচিকা।
সৌন্দর্যের তার নেই কোনো সম্বন্ধ সত্যের সাথে,
নেই কিছু ভগ্ন মুক্তা ছাড়া
তার সমুদ্রে।
তন্দ্রাকে সে মনে করতো মধুরতর,
নিশ্বাসে তার নির্বাপিত হয়েছিলো
আমাদের অগ্নি।
তার বুলবুলের সংগীতে
বিষাক্ত হয়েছিলো আত্মা ;
তার গোলাবের আস্তরণের নীচে
লুকিয়েছিলো এক ভূজংগ।
সতর্ক হও তার সোরাহী আর পিয়ালা সম্বন্ধে!
সাবধান তার অত্যুজ্জ্বল সুরায়!
ওগো, তোমরা–যারা অবনমিত হয়েছো
তার সুরা-রসে,
আর যারা নিবদ্ধ করেছো দৃষ্টি তার গেলাসে
নব পূর্বাশার আশায়,
যাদের অন্তর হিম করে দিয়েছে
তার দুঃখ-সংগীত,
তোমরা পান করেছো তীব্র হলাহল
কর্ণ দিয়ে!
তোমার জীবনের গতিধারাই হচ্ছে প্রমাণ
তোমার অধঃপতনের,
যন্ত্রের তন্ত্রী তোমার সুর-হীন!
পেটুকের শান্তিপ্রিয়তা করে তুলেছে তোমায় হতভাগ্য'
একটা অবমাননা ইসলামের
সারা বিশ্বের বুকে।

অন্ধ করে দিতে পারে তোমায় কেউ
একটা গোলাবের শিরা দিয়ে,
মৃদু বায়ে করতে পারে তোমায় আহত।
প্রেম লজ্জিত হয়েছে তোমার বিলাপে,
সুন্দর ছবি তার বিকৃত হয়েছে
তোমার তুলিতে।
তোমার পীড়া বিবর্ণ করেছে তার গণ্ডস্থল,
তোমার শীতলতা হরণ করেছে ঔজ্জ্বল্য
তার অগ্নির।

সে হয়েছে অন্তর-পীড়াগ্রস্ত
তোমার অন্তর-পীড়া থেকে ;
আর দুর্বল হয়েছে তোমার দুর্বলতায়।
পিয়ালা তার পূর্ণ শিশুর অশ্রুতে ;
গৃহ তার ভিক্ষা মাগছে মদ্যশালার দ্বারে,
চুরি করে সুন্দরীদের দৃষ্টি,
জাফরীর ফাঁক দিয়ে'
অসুখী, অবসন্ন, আহত,–
প্রহরীর পদাঘাতে মৃত্যুর দ্বারে পতিত,
নলের মতো বিনষ্ট দুঃখে,
মুখে তার সহস্র অভিযোগ
খোদার বিরুদ্ধে।

তোষামোদ আর আক্রোশ হোল উপাদান তার দর্পণের
অসহায়তা তার পুরাতন সংগী ;
এক শোচনীয় নীচ তাবেদার,
নেই যার কোন মূল্য, আশা অথবা উদ্দেশ্য,
বিলাপ যার অপহরণ করেছে তোমার আত্মার সার
আর বিদূরিত করেছে শান্তির নিদ্রা
তোমার প্রতিবেশীর আঁখি থেকে।
দুর্ভাগ্য সেই অগ্নির যা' গেছে নির্বাপিত হয়ে,
প্রেম–যা' জন্ম নিয়েছিলো পবিত্র ভূমিতে
আর মরেছে বোৎ-খানায়!

ওগো , কবিত্ব-ধন থাকে যদি তোমার ভাণ্ডারে
ঘর্ষণ করো তা' জীবনের পরশ-পাথরে!
অনাবিল চিন্তাধারা প্রদর্শন করে
কর্মের পথ,

যেমন বিদ্যুৎ-চমক অগ্রগামী হয় বজ্রের।
যোগ্য করবে তা' তোমার সুষ্ঠু সাহিত্য-সৃষ্টির,
যোগ্যতা দেবে ফিরে যেতে আরব-ভূমিতে ;
অন্তর তোমার দিতে হবে
সালমা আরাবীকে,[১২]
যেনো হেজাজের পূর্বাশা জন্ম নেয়
কুর্দিস্তানের তিমির-রাত্রি থেকে।[১৩]

গোলাব আহরণ করেছ তুমি
পারস্যের গুল-বাগিচা থেকে
আর দেখেছো হিন্দুস্তান আর ইরানের ভরা জোয়ার
এখন অনুভব করো একবার
মরুভূর প্রচণ্ড তাপ ;
পান করো একবার প্রাচীন খর্জুর সুরা।
পেতে দাও একবার তোমার মস্তক
তার তপ্ত বক্ষে,
পেতে দাও তোমার নাঙা দেহ তার উত্তপ্ত হাওয়ায়!
দীর্ঘকাল শায়িত ছিলে তুমি
রেশমের আস্তরণে ;
অভ্যাস করো এবার অমসৃণ তুলার বিছানা।

পুরুষানুক্রমে তুমি নৃত্য করেছো
সবুজের বুকে
আর ধৌত করেছো তোমার গণ্ডদেশ শিশির-জলে
গোলাবের মতো।
এখন নিক্ষেপ করো আপনাকে
জ্বলন্ত বালুরাশির উপরে,
নিমজ্জিত হও জমজমের ঝরণায়।
আর কতোকাল বৃথায় চীৎকার করবে তুমি
বুলবুলের মতো?
কতোকাল গড়বে তোমার আবাস বাগিচায়?
ওগো, ফাঁদে যাদের ধরা দেবে কল্পিত অমর পক্ষী,
বাঁধো নীড় উচ্চ পর্বতের শিখরে,
যে নীড় হবে বিদ্যুৎ আর বজ্রে ভরা
উচ্চতর ঈগলের নীড় অপেক্ষাও,
যেনো তুমি যোগ্য হোতে পার জীবন-যুদ্ধের,
যেনো তোমার দেহ আর আত্মা দগ্ধ হোতে পারে
জীবন-অনলে।

নবম অধ্যায়

[আত্মার শিক্ষার তিনটি স্তর আছে ঃ আইন ও নিয়মের অনুবর্তিতা, আত্মশাসন আর আল্লার প্রতিনিধিত্ব।]

আইন ও নিয়ম

উষ্ট্রের ধর্ম হোল সেবা আর শ্রম,
ধৈর্য আর অধ্যবসায় তার স্বভাব।
বালুকাময় প্রান্তরের উপর দিয়ে
নিঃশব্দে করে সে পাদবিক্ষেপ;
মরু-পথে চলে যেতো যাত্রী,
বাহন সে তাদের।
প্রতি মরুদ্যান অনুভব করে তার পাদক্ষেপ ;
আহারের জন্য নেই ব্যস্ততা, নিদ্রার জন্য নেই কাতরতা,
শ্রমে নেই ক্লান্তি।
যাত্রী পিঠে নিয়ে চলে সে,
আরো কতো রকম বোঝা,
চলে সে অবিরাম
গন্তব্যপথের শেষ সীমানা পর্যন্ত।
চলাই তার আনন্দ,
যাত্রীর চাইতে ধৈর্য বেশী তার
অবিরাম পথ চলায়।
তুমিও, হে মানুষ,
কর্তব্যের বোঝা বইতে কোর না অস্বীকার ;
তবেই পাবে লাভ করতে সেই স্বর্গপুর
যেখানে আল্লার নৈকট্য।
আইনের বিধান মেনে চলো,
হে অমনোযোগী আত্মা।
বাধ্যতার পরিণামই স্বাধীনতা।
অলস ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষ হয়ে উঠে কর্মী
এই আইনের বিধান মেনে,
আর অবাধ্যতায় তার অন্তরের আগুন হয়ে যায় ছাই।

আইনের কারায় হবে সে বন্দী,
যে চায় ইংগিতে চালাতে

ওই দূর আকাশের সূর্য
আর অগণিত তারকারাজি।
বাতাস তখনি হয়ে উঠে সুরভী,
যখন সে বন্দী হয় ফুলের বুকে,
সুরভী হয়ে উঠে কস্তুরী,
যখন সে হয় বন্দী কস্তুরী-মৃগের নাভি-মূলে।
আকাশের তারা চলে তার গন্তব্যপথে
মাথা নত করে প্রকৃতির নিয়মের কাছে।
তৃণও জেগে উঠে মাথা তুলে
সেও মানে ক্রমবর্ধনের নিয়ম ;
যখন সে করে তা' পরিত্যাগ
দলিত হয় সে মানবের পদতলে।
প্রদীপের ধর্ম
নিজের বুকে অবিরাম আগুন জ্বেলে
আলোকে-বিতরণ ;
আর রক্তের ধর্ম
শিরায় শিরায় নেচে চলা।
ছোট ছোট জল-বিন্দু
ঐক্যের নিয়মে হয়ে উঠে মহাসমুদ্র :
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা হয় সাহারা।
যদি আইনের বাধ্যতা
সকলের ভিতরে আনে অপরিমাণ শক্তি,
এই শক্তির উৎসকে
কেন করবে তুমি অবহেলা ?
ওগো, যারা ভুলে গেছো
প্রাচীন নিয়মকে–
আর একবার বদ্ধ কর তোমাদের পদযুগল
সেই রজত-শৃংখলে!
আইনের কঠোরতার জন্য কোর না অভিযোগ,
দলিত কোর না চরণ-তলে
মহামানুষ মুহাম্মদের বিধানকে।

আত্মশাসন

তোমার আত্মা পরোয়া করে শুধু নিজেকে
উষ্ট্রের মতো ;
অহংকারী, আত্মশাসিত, স্বেচ্ছাচারী সে।
মানুষ হয়ে উঠে,

ধর তার শাসন-রশ্মি নিজের হাতে,
যেনো তুমি হোতে পার হীরা-জহরত,
যদিও তুমি এক কুম্ভকারের মৃৎপাত্র।
অন্যের শাসন মানতে হয় তাকেই
যে শাসন করতে পারে না তার নিজেকে।
যখন তুমি সৃষ্ট হয়েছিলে মৃত্তিকা থেকে,
তোমার সৃষ্টির উপাদানে মিশ্রিত ছিলো
প্রেম আর ভয় ;
ইহকালের ভয়, পরকালের ভয়, মৃত্যুর ভয়,
স্বর্গমর্ত্যের শত ব্যথা-বেদনার ভয় ঃ
আর প্রেম,
ঐশ্বর্যের আর শক্তির প্রেম,
দেশ-প্রেম,
নিজের, স্বজনগণের আর পত্নীর প্রেম!
মানুষ,
যার মাঝে মৃত্তিকার সাথে মিশ্রিত হয়েছে জল,
ভালোবাসে শুধু শান্তি,
পাপাচার আর অসাধুতার প্রেমে সে আসক্ত।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র রশ্মি
যতোক্ষণ আছে তোমার হস্তে,
করতে পারবে তুমি ব্যর্থ সকল ভয়ের আক্রমণকে।
আল্লাহ্ যার দেহের ভিতরে আত্মার মতো,
অহমিকার কাছে শির তার অবনত হয় না।
ভীতি পায়না প্রবেশ-পথ তার বুকে,
আত্মা তার আর কাউকে করে না ভয় আল্লাহ্ ছাড়া।
আবাস যার অনস্তিত্বের পৃথিবীতে,
(উপাসনা করে না যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও)
মুক্ত সে
পত্নীর আর সন্তান-সন্ততির প্রেম থেকে।
দৃষ্টি তার সংযত হয় সব দিক থেকে
শুধু আল্লাহ ছাড়া,
চালাতে পারে সে ছুরিকা
তার পুত্রের গলদেশে।
হোতে পারে সে একা,
তবু সে একাই একটা বিরাট অভিযান-রত

বাহিনীর মতো ;
জীবন তার কাছে মূল্যহীন বাতাসের চেয়েও।
ঈমান হোল শক্তি,
আর নামায তার মাঝে মুক্তা ঃ
মুসলিমের আত্মা নামাযকে মনে করে ক্ষুদ্রতর হয।
মুসলিমের হাতে নামায তরবারির মতো,
হত্যা করে তা' দিয়ে সে
পাপ স্বেচ্ছাচার আর অন্যায়কে।
রোযা দমন করে ক্ষুধা আর তৃষ্ণাকে ;
ভেঙ্গে ফেলে সে ইন্দ্রিয়পরতার দুর্গম দুর্গ।

এই সবই হোল সত্যিকার পন্থা
তোমার আত্মাকে শক্তিশালী করে তোলবার,
অজেয় তুমি,
যদি তোমার ইসলাম হয় শক্তিশালী।
শক্তি সঞ্চয় কর
সর্বশক্তির উৎস আল্লার প্রার্থনা থেকে,
তবেই তুমি পারবে আরোহী হোতে
তোমার দেহের উষ্ট্রে।

আল্লার প্রতিনিধি

যদি তুমি শাসনে রাখতে পার
তোমার উষ্ট্রকে,
তবেই তুমি পারবে বিশ্বকে শাসন করতে,
আর পরতে পারবে তোমার শিরে
সোলায়মানের রাজমুকুট।
তুমি হবে বিশ্বের গৌরব
যতোদিন থাকবে তার অস্তিত্ব,
তুমি শাসন করবে সেই রাজ্য,
যেখানে নেই কোনো ব্যভিচার।
আল্লার প্রতিনিধি হওয়া এই বিপুল বিশ্বে,
আর আধিপত্য করা
তাঁর সৃষ্ট পদার্থের উপর,
কতো মধুর আনন্দময়!
আল্লার প্রতিনিধি
এই বিপুল বিশ্বের আত্মা-স্বরূপ,
আর অস্তিত্ব সেই মহানামের প্রতিবিম্ব।

সে জানে
খণ্ড ও অখণ্ডের অন্তর্নিহিত রহস্য ;
পালন করে সে আল্লার নির্দেশ
এই বিরাট ধরিত্রীর বুকে।
যখন সে তার শিবির সন্নিবেশ করে
এই বিস্তৃত ধরণীর উপর,
আবর্তন করে সে মহাকালের আস্তরণ।
প্রতিভা তার জীবন-ধারায় পরিপূর্ণ,
আর চায় সে স্বয়মপ্রকাশ হোতে ;
অস্তিত্বে আনবে সে আর একটা নূতনতর বিশ্ব।
খণ্ড ও অখণ্ডের এই বিশ্বের মতো
অনন্ত বিশ্ব জাগ্রত হয়ে ওঠে
গোলাব-পাপড়ির মতো
তার কল্পনার বীজ থেকে।
অপরিণত প্রকৃতিকে সে করে তোলে পরিপক্ক,
বিদূরিত করে দেয়
সব মৃন্মূর্তিকে মন্দির-বেদী থেকে।
স্পর্শে তার
অন্তরের তন্ত্রীতে জাগ্রত হয় অমর-গীতি,
সে জাগ্রত হয় আর নিদ্রিত হয়
শুধু আল্লারই জন্য।
তার যুগকে সে শিখিয়ে যায়
যৌবনের জয়গান
আর রাঙ্গিয়ে তোলে সব কিছুকে
যৌবনের রঙ্গে।
মানব জাতির কাছে বহন করে আনে সে
আনন্দ-বার্তা আর সতর্ক-বাণী,
সৈনিক হয়ে আসে সে,
সে হয়ে আসে সেনাপতি এবং রাজা।

"আল্লাহ আদমকে শিখিয়েছিলেন
সব পদার্থের নাম।"–
এই বাণীর কারণ সে।
"প্রশংসা তাঁরই
যিনি প্রেরণ করেছেন
তাঁর রসুলকে রাত্রির অন্ধকারে।"–
সে-ই হোল
অন্তর্নিহিত রহস্য এই বাণীর।
আসা[১৪] হাতে পেয়ে

শক্তিমান হয়ে ওঠে তার শ্বেত হস্ত,
তার জ্ঞানের সাথে এসে মিলিত হয়
এক পরিপূর্ণ মানুষের শক্তি।
বীর অশ্বারোহী সৈনিক
যখন ধারণ করে তার রশ্মি,
কালের অশ্ব তখন
ছুটে চলে দ্রুততর গতিতে।
তার আশ্চর্য মুখাবয়ব
শুষ্ক করে তোলে লোহিত সাগরকে,
চালিত করে সে ইসরাইলদেরকে
মিসরের বাহিরে।
তার কণ্ঠে যখন ধ্বনি ওঠে,
'জাগ্রত হও,'
তখন মৃত আত্মাসমূহ জেগে ওঠে
তাদের সমাধি-তলে
ময়দানের মাঝে পাইন-বৃক্ষের মতো।

তার ব্যক্তিত্ব
সারা পৃথিবীর কাছে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ,
মহিমায় তার সমগ্র ধরিত্রী পায় পরিত্রাণ।
তার সেই পরিত্রাণ-কর্তা রূপের প্রতিবিম্ব
অণুপরমাণুকে করে সূর্যের সাথে পরিচিত,
তার অন্তরের ঐশ্বর্য করে তোলে মূল্যবান সব কিছুকে
যার অস্তিত্ব আছে।
সে বিতরণ করে জীবন-ধারা
তার অলৌকিক কর্ম দ্বারা,
জীবনের প্রাচীন ধারাকে সে করে তোলে নূতনতর।
দীপ্তিমান স্বপ্ন
জেগে ওঠে তার পদাংক থেকে,
তার সিনাই দ্বারা প্রবিষ্ট হয় কতো মূসা।

সে দিয়ে যায় জীবনের নূতনতর ব্যাখ্যা,
এই স্বপ্নের একটা নূতনতর অর্থ।
তার লুক্কায়িত সত্তাই হোল জীবনের রহস্য,
জীবন-বীণার না-শোনা সংগীত।
প্রকৃতি ভোগ করছে যুগ-যুগান্তর ধরে প্রসব-বেদনা
রক্তাক্ত হয়ে শুধু জন্ম দিতে তার ব্যক্তিত্ব।
এক মুঠা মৃত্তিকা
উঠে গেছে নভোবিন্দুতে

সেই মৃত্তিকায় জন্ম নেবে
এক বিজয়ী বীর।
আজকের ভস্মের মাঝে
ঘুমিয়ে আছে এমন এক অগ্নি
যা কাল সমগ্র বিশ্বকে করবে জ্বালাময়
তার লেলিহান শিখা বিস্তার করে।
আমাদের কুঁড়িরা
ফুটিয়ে তুলবে এক বাগান গোলাব,
আমাদের চক্ষু
অনাগত উষার আশায় সমুজ্বল।
নেমে এসো, ওগো অদৃষ্টের আরোহী
নেমে এসো, ওগো মহা পরিবর্তনের আঁধারের আলো।
অস্তিত্বের দৃশ্যকে জ্যোতিস্মান করে তোল,
আমার আঁখির অন্ধকারে তুমি এসে স্থান নেও।
জাতির কোলাহলকে করে দাও নিস্তব্ধ,
স্বর্গের মাধুরী বয়ে আনুক
আমাদের কর্ণের কাছে।

জাগ্রত হও,
বাজিয়ে তোলো বীণায় ভ্রাতৃত্বের সুর,
ফিরিয়ে দাও আমাদেরকে সেই প্রেমের সুরাপাত্র।
আর একবার
বয়ে আনো সেই শান্তির দিন এই পৃথিবীতে,
শান্তির বাণী পৌঁছে দাও তাদের কানে,
যারা চায় যুদ্ধ!
মানব-জাতি শস্য-ক্ষেত্র
আর তুমি তার ফসল ;
তুমি জীবন-যাত্রীর কাফেলার
গন্তব্য পথের শেষ সীমানা!
হেমন্তের নিষ্ঠুরতায়
সব বৃক্ষ-পত্র গেছে ঝরে
ওগো, বয়ে এসো তুমি বসন্তের মতো
আমাদের উদ্যানের উপর দিয়ে!
গ্রহণ করো অবনত ললাট থেকে আমাদের
শিশু, যুবা বৃদ্ধ–সকলের আনন্দ-অভিবাদন।
আমাদের যা' কিছু সম্মান,
শুধু তোমারই ঋণ।
আজ আমরা নীরবে বয়ে যাই
জীবনের ব্যথা-বেদনা।

দশম অধ্যায়

[হযরত আলীর (রাঃ) নামসমূহের ভেতরের অর্থ নিয়ে]

আলী–প্রথম মুসলিম আর মানুষের রাজা,
প্রেমের দৃষ্টিতে আলী ঈমানের ভাণ্ডার।
পরিবারের প্রতি তাঁর অনুরাগ
অনুপ্রাণিত করে আমায় জীবন-ধারায়,
যেনো আমি একটি দীপ্তিমান মুক্তা।
নার্গিস ফুলের মতো
আনন্দিত আমি স্থির দৃষ্টিপাতে ;
সুরভীর মতো আমি দিশাহারা হয়ে ছুটি
তাঁর প্রমোদ-নন্দনের ভিতর দিয়ে।
যদি পবিত্র জল-ধারা
নির্গত হয় আমার ভূমি থেকে,
উৎস তার তিনিই ;
যদি সুরা নির্গত হয় আমার দ্রাক্ষা-বক্ষ থেকে,
তিনিই তার কারণ।
ধূলিমুষ্টি আমি,
কিন্তু সূর্য তাঁর করেছে আমায়
দর্পণের মতো,
সংগীত দৃশ্যমান আমার বক্ষোমাঝে।
মহান নবী দেখেছিলেন কতো শুভ লক্ষণ
আলীর মুখ দর্পণে,
গৌরবে তাঁর গৌরবী হয়েছে সত্যধর্ম।

আদেশ তাঁর ইসলামের শক্তি-স্বরূপ ;
সকল পদার্থ হয় ভক্তি-প্রণত
তাঁর বংশের কাছে।
আল্লার রসুল দিয়েছিলেন তাঁর নাম 'বু-তোরাব'
আল্লাহ কোরআনে দিয়েছেন তাঁর নাম
'আল্লার হস্ত'
যে কেহ পরিচিত জীবন-রহস্যের সাথে–
জানে আলীর নাম-সমূহের

অন্তর্নিহিত অর্থ।

সেই মলিন কর্দম–যার নাম দেহ,
যুক্তি আমাদের বিক্ষুব্ধ হচ্ছে তার দুস্কৃতির জন্য।
শুধু তারই জন্য
নভোস্পর্শী চিন্তাধারা আমাদের
লুণ্ঠিত হয় ধরণীর ধূলিতলে।
সে আমাদের আঁখিকে করে অন্ধ
আর কর্ণকে করে তোলে বধির।
হাতে তার প্রলোভনের দু'ধারী তলওয়ার ঃ
এই দস্যু-হস্তে বিদীর্ণ হয় পথিকের বক্ষ।
আলী–আল্লার সিংহ–
দমিত করেছিলেন দেহের কর্দমকে
আর পরিণত করেছিলেন মলিন মৃত্তিকাকে সুবর্ণে।
মুরতজা–তরবারির ঝলকে যাঁর
সপ্রকাশ হোত সত্যের শিখা,
লাভ করেছিলেন বু-তোরাব খেতাব,
তাঁর দেহকে জয় করে ;[১৫]
মানুষ দিগ্বিজয়ী হয় যুদ্ধে তার দুর্দম শক্তিতে,
কিন্তু তার অন্তরের অত্যুজ্জ্বল মণি
তার আত্মজয়।
পশ্চিম গগন থেকে ;[১৬]
যে কেহ রশ্মি ধারণ করে দৃঢ়রূপে
তার দেহের অশ্বের,
অধিষ্ঠান করে মধ্যমণির মতো
রাজ মুকুটের মাঝে ঃ
এই খানেই ধুলিলুণ্ঠিত হয় খয়বরের শক্তি
তার চরণ–তলে, [১৭]
রোজ-কিয়ামতে হস্ত তার পরিবেশন করবে
আবে–কাওসার।[১৮]
আত্ম–জ্ঞান দ্বারা
তিনি কর্ম করেছিলেন আল্লার হস্তের,
আল্লার হস্ত হয়েই
শাসন চালিয়েছিলেন সকলের উপর।
তিনি ছিলেন দুর্গ-দ্বার বিজ্ঞানের নগরীর ;[১৯]
আরব, চীন ও গ্রীস হয়েছিলো তাঁর পদানত।

যদি তুমি পান কর স্বচ্ছ সুরা
তোমার আপন দ্রাক্ষা থেকে,
তোমায় প্রভুত্ব করতেই হবে
তোমার আপন মৃত্তিকার উপর।
মৃত্তিকায় পরিণত হওয়া পতংগের ধর্ম ;
জয়ী হও মৃত্তিকার উপর,
সেই হোল যোগ্য কাজ মানবের।
কমনীয় তুমি কুসুমের মতো,
কঠোর হয়ে ওঠ প্রস্তরের ন্যায়,
যেনো তুমি হোতে পার জান্নাতের প্রাচীর-ভিত্তি!
তোমার কর্দমকে পরিণত কর একটি মানবে,
তোমার মানবকে পরিণত কর বিশ্বে।
তোমার আপন মৃত্তিকা থেকে
যদি তুমি নির্মাণ না কর তোমার প্রাচীর অথবা দ্বার,
অপর কেহ নির্মাণ করবে ইষ্টক
তোমার মৃত্তিকা থেকে।
ওগো, –যে অভিযোগ কর আল্লার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে,
কাঁচ যার চীৎকার করে
প্রস্তরের অবিচারের বিরুদ্ধে,
আর কতোকাল এই বিলাপ, চীৎকার আর শোক?
আর কতো চলবে এই চিরন্তন বুক চাপড়ানি?
জীবনের সার লুক্কায়িত কর্মের ভিতরে,
সৃষ্টির আনন্দই হচ্ছে জীবনের নিয়ম।
জাগ্রত হও, সৃষ্টি কর নূতন জগৎ!
আবৃত কর আপনাকে অনল-শিখায়,
হয়ে ওঠ এব্রাহিমের মতো!
এই বিশ্বের সাথে তাল রেখে চলা,
যে ভালোবাসে না তোমার সংকল্পকে,
সে শুধু দূরে নিক্ষেপ করা বর্ম
সমর-ক্ষেত্রের মধ্যে।
সবল-চরিত্র মানব–
যে প্রভু তার আপনার,
লাভ করে সৌভাগ্য অপরিমাণ।
যদি বিশ্ব না মেনে নেয় তার খেয়াল,
সে পরীক্ষা করবে যুদ্ধের দুর্ঘটনাকে
স্বর্গের সাথে ;

খনন করবে সে বিশ্বের ভিত্তিমূল
আর লাগবে তার প্রতি পরমাণুকে নব সৃষ্টিতে।
বিপর্যস্ত করবে সে সময়ের গতিকে,
আর ধ্বংস করবে নীল আকাশের আবরণ ;
তার আপন শক্তিতে
সে সৃষ্টি করবে একটা নবীন বিশ্ব–
যা' চলবে তার খুশীতে।
যে বেঁচে থাকতে পারে না এই বিশ্বের বুকে
মানুষের মতো,
তার বীরের মতো মৃত্যুবরণই শ্রেয়!
আছে যার সতেজ অন্তর,
প্রমাণিত করবে সে তার শক্তি
মহান কর্ম দ্বারা।
মধুর প্রেমকে ব্যবহার করা কঠোর কর্তব্যে,
আর গোলাব সংগ্রহ করা এব্রাহিমের মতো
অনল-কুণ্ড থেকে।
কর্ম-প্রিয় মানুষের শক্তি
প্রকাশ লাভ করে–
যা' কিছু কঠোর, তাকে গ্রহণের ভিতর দিয়ে।
নীচ আত্মার নেই কোনো অস্ত্র
আর্ত বিলাপ ছাড়া,
জীবনের আছে একটি মাত্র নিয়ম।
জীবন শক্তির প্রকাশ,
আর তার উৎস বিজয়ের আকাংখা।
অপাত্রে করুণা
জীবনের শোণিত–ধারাকে করে শীতল,
তা হচ্ছে জীবন-সংগীতের ছন্দপাত।
অকীর্তির গভীরে যে আছে নিমজ্জমান,
সে দুর্বলতাকে বলে সন্তোষ।
দুর্বলতা জীবনের লুণ্ঠনকারী,
উদর তার পরিপূর্ণ ভয় আর মিথ্যায়।
আত্মা তার ধর্মহীন,
পরিপুষ্ট হয় পাপ তার দুগ্ধ পানে।
ওগো বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানব,
সাবধান!
এই লুণ্ঠনকারী আড়ি পেতে আছে

গোপন গুহায়,
তার দ্বারা প্রতারিত হয়ো না, যদি তুমি হও জ্ঞানী,
বহুরূপীর মতো,
প্রতি মুহূর্তে সে পরিবর্তন করে তার রঙ।
তীক্ষ্নদর্শীর চোখেও ধরা দেয় না তার রূপ ঃ
পর্দার আবরণ তার মুখের উপর।
এখন সে আবৃত দয়া আর সৌজন্যে,
এখন সে পরিহিত মানবতার পরিচ্ছদ।
কখনো সে গ্রহণ করে বাধ্যতার ছদ্মবেশ,
কখনো ক্ষমনীয় রূপ।
সে প্রকাশিত হয় আত্ম-চরিতার্থতার রূপে
আর হরণ করে বরশালীর অন্তর থেকে সাহস।
শক্তি সত্যের জমজ ভ্রাতা ;
যদি তুমি জানো তোমার আত্মাকে,
শক্তি সত্য-প্রকাশের দর্পণ।
জীবন বীজ, আর ক্ষমতা তার ফসল ;
ক্ষমতা বুঝিয়ে দেয়
সত্য-মিথ্যার রহস্য।
কোনো দাবীদার,–যদি থাকে তার ক্ষমতা,
প্রয়োজন নেই তার দাবীর স্বপক্ষে
কোন যুক্তির।
মিথ্যা ক্ষমতা থেকে গ্রহণ করে সত্যের অধিকার
আর সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করে
মনে করে তাকে সত্য।
সৃজনকারী বাণী তার হলাহলকে রূপ দেয় অমৃতের ;
শ্রেয়কে বলে সে,–'নিকৃষ্ট তুমি'
আর শ্রেয় হয়ে যায় নিকৃষ্ট।
ওগো, অসাবধান যারা তোমাদের প্রতি প্রদত্ত বিশ্বাসে,
বিশ্বাস কর নিজদেরকে
উভয় বিশ্বের সেরা বলে।[২০]
লাভ কর জ্ঞান জীবন-রহস্যের!
দুর্দমনীয় হও!
হেলায় অপসারিত কর আল্লাহ ছাড়া সকলকে!
ওগো জ্ঞানী মানুষ,
খুলে দাও তোমার চক্ষু, কর্ণ আর মুখ।
তারপরও যদি পাও সত্যের পন্থা,
গালি বর্ষণ কোর আমায়!

একাদশ অধ্যায়

[একটি কাহিনী। মরভ দেশীয় এক যুবক দরবেশ আল হুজিরী রাহমাতুল্লাহ আলায়হের দরবারে এসে হাযির হয়েছিলেন এবং অভিযোগ করেছিলেন যে, তিনি তাঁর দুশমনের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছেন।]

হুজিরের দরবেশ ছিলেন সম্মানিত
মানুষের কাছে;
পীর-ই-সঞ্জর তাঁর সমাধি দর্শন করেছিলেন
তীর্থযাত্রী হয়ে।[১১]
সহজেই তিনি অতিক্রম করেছিলেন পর্বতের বাধা
আর বহন করেছিলেন ইসলামের বীজ
হিন্দুস্তানের বুকে।
ঐশী ক্ষমতায় তিনি ফিরিয়ে এনেছিলেন
ওমরের যুগ,
বাণীতে তাঁর জেগে উঠেছিলো সত্যের খ্যাতি।
তিনি ছিলেন ক্বোরআনের সম্মান-রক্ষক,
দৃষ্টিতে তাঁর ধসে পড়েছিলো
মিথ্যার মন্দির।
নিশ্বাসে তাঁর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলো
পাঞ্জাবের ধূলিকণা,
রবিরশ্মিতে তাঁর অত্যুজ্জ্বল হয়েছিলো
আমাদের পূর্বাশা।

তিনি ছিলেন প্রেমিক
আরও ছিলেন প্রেমের দূত ;
ভ্রূযুগ হোতে তাঁর বিচ্ছুরিত হোত,
প্রেমের গোপন বাণী।
বলবো আমি তাঁর পূর্ণতার এক কাহিনী
আর বেঁধে দেব সব গোলাবের আস্তরণকে
একটি মাত্র কলির সাথে।
এক তরুণ যুবক–সাইপ্রেস বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘতনু,
এসেছিলেন মরভ থেকে লাহোরে।
দর্শন করতে গেলেন তিনি ভক্ত দরবেশকে
যেনো সূর্যরশ্মি বিদূরিত করে

তাঁর অন্ধকার।
"উৎপীড়িত আমি দুশমনদের দ্বারা"–
বললেন তিনি,
"কাঁচের মতো আমি প্রস্তরের মাঝখানে।
শিক্ষা দিন আমায় ওগো স্বর্গীয় সম্মান–প্রাপ্ত দরবেশ,
কিভাবে অতিবাহিত করবো আমার জীবন
দুশমনদের মাঝখানে!"
জ্ঞানী পথ-প্রদর্শক–
চরিত্রে যার প্রেম জন্ম দিয়েছিলো
সৌন্দর্য ও গৌরব–
বললেন উত্তরে ঃ
"তুমি জীবন-সংগীতের সাথে নহ পরিচিত,
অসতর্ক তার অন্ত ও আদি সম্বন্ধে।
নির্ভীক হও অপরের থেকে!
তুমি একটা ঘুমন্ত শক্তি ;
জাগ্রত হও!
প্রস্তর যখন ভাবলো তার নিজকে কাঁচ বলে,
সে হোল কাঁচে পরিণত
আর হোল ভংগুর।
যদি পথিক মনে করে নিজকে দুর্বল,
সে আত্ম-বিসর্জন করে দস্যু-হস্তে।
কতোকাল আর তুমি ভাববে নিজেকে জল ও কর্দম বলে?
তোমার কর্দম থেকে তুমি সৃষ্টি কর
এক জ্বালাময় সিনাই।
কেন ক্রুদ্ধ হও শক্তিমান মানুষের বিরুদ্ধে?
কেন অভিযোগ কর দুশমনের জন্য?
ঘোষণা করবো আমি সত্য ঃ
দুশমনই তোমার বন্ধু!
অস্তিত্ব তার পরায় তোমায় গৌরবের রাজ-মুকুট।
অপরিচিত যে আত্মার অবস্থার সাথে,
শক্তিমান দুশমনকে মনে করে সে
আল্লার আশীর্বাদ।
মানব-বীজের কাছে দুশমন শ্রাবণের মেঘ ঃ
জাগ্রত করে সে তার অন্তর্নিহিত শক্তি।
যদি তোমার আত্মা হয় শক্তিশালী,
তোমার পথের প্রস্তর হবে জলের মতো ;

কিসে ভয় করে পথের উত্থান-পতনের স্রোত?
সংকল্পের অসি শাণিত হয় পথের প্রস্তরে
আর প্রমাণিত করে আপনার শক্তি
পদে পদে বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে।
কি লাভ পশুর মতো আহার-নিদ্রায়?
কি লাভ তোমার সত্তায়
যদি শক্তি না থাকে তোমার অন্তরে?
যখন তুমি আত্মা দ্বারা কর আপনাকে শক্তিমান,
ধ্বংস করতে পার তুমি বিশ্বকে
তোমার খোশ-খেয়ালে।
যদি তুমি বরণ কর মৃত্যু, আত্মমুক্ত হও ;
যদি তুমি থাক জীবন্ত, পরিপূর্ণ হও আত্মায়।[২২]

মৃত্যু কি? আত্মবিস্মৃত হওয়া।
কেন কল্পনা কর তাকে দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ বলে?
দৃঢ় হও আত্মার ইউসুফের মতো!
বন্দীদশা থেকে অগ্রসর হও রাজত্বে!
ভাব আত্মার কথা, কর্মপ্রিয় মানুষ হও!
আল্লার মানুষ হও,
বহন কর রহস্য অন্তরে!"
আমি করবো সকল পদার্থের ব্যাখ্যা কাহিনীর সাহায্যে,
ফুটিয়ে তুলবো আমি কুঁড়িকে
আমার নিশ্বাসের শক্তিতে।
'উৎকৃষ্টতর প্রেমিকের কাহিনী বর্ণনা
অপরের মুখ দিয়ে।'[২৩]

দ্বাদশ অধ্যায়

[একটি তৃষ্ণাতুর পাখীর কাহিনী]

একটি পাখী হয়েছিল তৃষ্ণার্ত,
দেহের নিশ্বাস তার হয়ে এসেছিলো ভারী
ধুম-কুণ্ডলীর মতো।
বাগিচার ভিতরে দেখলো সে একখণ্ড হীরক,
তৃষ্ণা জন্মালো এক জলের মায়া।
সূর্যকরোজ্জ্বল প্রস্তরের প্রতারণায়
অজ্ঞ পাখী ভাবলো তাকে জল।
সে পেল না কোনো রস এই হীরকের বুকে,
সে ঠোকরাতে লাগলো তাকে চঞ্চু দ্বারা,
কিন্তু তাতে সিক্ত হোল না তার তালু।

"ওরে ব্যর্থ আকাংখার দাস,"–বললে হীরক,–
"শাণিত করেছো তোমার লুব্ধ চঞ্চু আমার উপর,
কিন্তু আমি নহি শিশির-বিন্দু, দেই না আমি পানীয়,
বেঁচে থাকি না আমি অপরের জন্য।
আঘাত কর তুমি আমাকে?
উন্মাদ তুমি।
যে জীবন সপ্রকাশ করে আত্মাকে,
পরিচয় নেই তোমার তার সাথে।
আমার জল ভেঙে দেবে পক্ষীর চঞ্চু,
আর ভাঙবে মানব-জীবনের রত্ন।"[২৪]
পাখী লাভ করলো না তার অন্তরের আকাংখা
হীরকের কাছে,
আর ফিরে এল দীপ্ত প্রস্তরখণ্ডের কাছ থেকে।
হতাশা জাগ্রত হোল তার বুকে,
তার কণ্ঠের সংগীত পরিণত হোল আর্তবিলাপে।
গোলাব-শাখার উপর এক বিন্দু শিশির
জ্বলজ্বল করছিলো
বুলবুলের আঁখি-কোণ অশ্রুর মতো,

তার দীপ্ত ছিলো সূর্যকরেরই জন্য,
সূর্যের ভয়ে সে ছিলো প্রকম্পিত,
একটি বিচঞ্চল আকাশোদ্ভূত তারকা
মুহূর্তের জন্য পতিত ভূমিতলে,
আকাংখা দ্বারা পরিদৃশ্যমান,
কখনো প্রতারিত কলি এবং পুষ্প দ্বারা,
সে লাভ করে নি কিছুই জীবন থেকে।
সে ছিলো ঝুলায়মান, পতনোন্মুখ,
অশ্রুর মতো প্রেমিকের আঁখিকোণে,
যে হারিয়েছে তার অন্তরতমকে।
সেই আর্তবিপন্ন পাখী
লাফিয়ে বসলো গিয়ে গোলাব-কুঞ্জের ভিতরে,
শিশির-বিন্দু ঝরে পড়লো তার মুখে।

ওগো, যে মুক্ত করবে তোমার আত্মাকে শত্রু-হস্ত থেকে,
জিজ্ঞাসা করি তোমায়,
"তুমি কি সলিল-বিন্দু, না একটি রত্ন?
পাখী যখন বিগলিত হচ্ছে তৃষ্ণার অনলে,
সে তখন গ্রাস করেছে অপরের জীবন।
বিন্দুটি ছিলো আত্মা, যা' ছিলো না বিন্দুর।
কখনো মুহূর্তের জন্য আত্ম-সংরক্ষণে কোর না অবহেলা ঃ
হয়ে ওঠ হীরক, শিশির-বিন্দু নয়!
প্রকৃতিতে হও বৃহদায়তন, পর্বতের মতো,
শিখরে তোমার বহন কর মেঘমালা
বর্ষাসলিলে পরিপূর্ণ!
রক্ষা কর আপনাকে আত্মস্বীকৃতি দ্বারা,
সংকুচিত কর তোমার পারদকে রজত-রেখায়!
সৃষ্টি কর বিলাপ-গীতি তোমার আত্মার তন্ত্রীতে,
সপ্রকাশ কর আত্মার রহস্য!

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[হীরক ও কয়লার কাহিনী ।]

এখন আমি খুলে দেবো আর একটি সত্যের দ্বার,
বলবো আমি তোমায় আর একটি কাহিনী।
খনির ভিতরে কয়লা বললে হীরককে,
"ওগো চিরন্তন জ্যোতির্ময়,
সাথী আমরা, আর সত্তা আমাদের এক ;
একই আমাদের অস্তিত্বের মূল,
তবু যখন আমি মরে যাই অকিঞ্চিৎকরতার
যাতনায়,
তখন স্থান তোমার সম্রাটের মুকুটে।
এত কুৎসিত আমার উপাদান,
আমি মৃত্তিকা অপেক্ষাও কম দামী,
আর দর্পণের বক্ষ বিদীর্ণ হয় তোমার সৌন্দর্যে।
অন্ধকার আমার আলোময় করে উত্তপ্ত পাত্রকে,
তারপর আমার সার যায় ভস্মীভূত হয়ে।
প্রত্যেক মানুষ স্থাপন করে তার পদ আমার মস্তকে
আর আবৃত আমার সত্তাকে
ভস্ম দ্বারা।
দুঃখিত হোতেই হবে আমার অদৃষ্টে ;
জানো তুমি, আমার সত্তার সার কোথায়?
সে হচ্ছে একটা ঘনীভূত ধূমকুণ্ডলী,
সাথে তার একটিমাত্র স্ফুলিংগ।
বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিতে তুমি তারকা-তুল্য,
সবদিক থেকে তোমার বিচ্ছুরিত হয় জ্যোতি।
এখন তুমি পরিণত হও রাজার আঁখির আলোয়,
কখনো সজ্জিত কর
তরবারির হাতল।"
"ওগো বিচক্ষণ বন্ধু"—হীরক বললে,—
"মলিন মৃত্তিকা যখন হয় শক্ত,
মর্যাদায় হয় তখন প্রস্তরাধার তুল্য।
পারিপার্শ্বিকতার সাথে চলে তার সংগ্রাম,

সংগ্রামে পরিপক্ক হয়ে সে হয় কঠোর
প্রস্তরের মতো।
পরিপক্কতাই প্রদান করেছে আমায় আলোক
আর পূর্ণ করেছে আমার বক্ষ জ্যোতিতে।
যেহেতু সত্তা তোমার অপরিপক্ক,
তাই তুমি হয়েছো নীচ ;
দেহ তোমার কোমল বলেই হয় দগ্ধীভূত।
পরিত্যাগ কর ভয়, দুঃখ আর উদ্বেগ,
কঠোর হয়ে ওঠ প্রস্তর-তুল্য,
হয়ে ওঠ হীরক-খণ্ড!
যে করে কঠোর সংগ্রাম আর ধারণ করে দৃঢ়হস্তে,
উভয় জগৎ আলোকিত হয় তার দ্বারা।
একটু সামান্য মৃত্তিকা কৃষ্ণ প্রস্তরের মূল
যে তার মস্তক স্থাপন করেছে
কাবার বক্ষে ;
মর্যাদা তার উচ্চতর সিনাই অপেক্ষা।
সে চুম্বন লাভ করে কৃষ্ণ ও শুভ্র সকলের
কঠোরতায় নিহিত রয়েছে জীবনের গৌরব;
দুর্বলতাই হোল অকিঞ্চিতকরতা ও
অপরিপক্কতা।"

চর্তুদশ অধ্যায়

[শেখ ও ব্রাহ্মণের কাহিনী। তারপর হিমালয় ও গংগা নদীর কথোপকথন। এর সারমর্ম–সমাজ জীবনের ধারাবাহিকতা নির্ভর করে জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সাথে দৃঢ় বন্ধনের উপর।]

কাশীতে ছিলো এক সম্মানিত ব্রাহ্মণ,
মস্তিষ্ক তার নিমজ্জিত ছিলো
সত্তা ও অসত্তার মহাসমুদ্রে।
ছিলো তার বিরাট জ্ঞান দর্শন-শাস্ত্রে–
অতি-নিবিষ্ট ছিলো সে
ঈশ্বর-সন্ধানীদের কাছে।
ব্যস্ত ছিলো তার অন্তর নূতন সমস্যার আলোচনায়,
বুদ্ধি তার বিচরণ করতো
সপ্তর্ষিমণ্ডলের উচ্চতায় ;
নীড় তার ছিলো অংক পাখীর নীড়ের মতো উচ্চে ;[২৫]
রবি-শশী নিক্ষিপ্ত হোত তার চিন্তার অনলে,
ইন্ধনের মতো।
দীর্ঘকাল সে করলো পরিশ্রম
আর হোল ঘর্মাক্ত,
কিন্তু দর্শনশাস্ত্র আনলো না কোন সুরারস
তার পিয়ালায়।
যদিও সে পাতলো বহু ফাঁদ
জ্ঞানের বাগিচায়,
ফাঁদে তার কোন দিন দিলো না ধরা
তার আদর্শ পক্ষী ;
যদিও চিন্তার নখর হোল তার শোণিত-সিক্ত,
সত্তা ও অসত্তার বন্ধন থাকলো অসংবদ্ধ।
তার ওষ্ঠের দীর্ঘশ্বাস সাক্ষ্য দিলো তার হতাশার,
আকৃতি তার প্রকাশ করলে কাহিনী
তার বিভ্রান্তির।
একদিন হোল তার মোলাকাত এক প্রসিদ্ধ শেখের সাথে,
বক্ষে যাঁর ছিলো একটি অন্তর
সুবর্ণময়।
ব্রাহ্মণ দিলে নীরবতার মোহর তার ওষ্ঠযুগলে,

কর্ণকে অভিনিবিষ্ট করলে
সেই দরবেশের আলাপনে।
তারপর বলতে লাগলেন শেখ,–
"ওগো অত্যুচ্চ আকাশ-লোক চারী,
প্রতিজ্ঞা কর একটু সত্য হোতে এই পৃথিবীর কাছে!
পথ-হারা হয়েছো তুমি
কল্পনার গহণ অরণ্যে,
নির্ভীক চিন্তাধারা তোমার ছাড়িয়ে গেছে স্বর্গলোক।
আপোষ কর পৃথিবীর সাথে,
ওগো নভোচারী মুসাফির!
ঘুরে মরো না তারকা-মণ্ডলীর সার অনুসন্ধানে!
আদেশ করছি না আমি পরিত্যাগ করতে মূর্তিপূজা।
অবিশ্বাসী তুমি?
উপযুক্ত হও তোমার জুন্নারের![২৬]

ওগো প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী,
পৃষ্ঠপ্রদর্শন কোর না সেই পথকে
যে পথে বিচরণ করেছে তোমার পূর্বপুরুষ!
যদি মানব-জীবন উদ্ভূত হয় ঐক্য থেকে,
তা হলে অবিশ্বাসও সেই ঐক্যেরই উৎসমূল।
যদি তুমি না হতে পার পরিপূর্ণ অবিশ্বাসী,
অনুপযুক্ত তুমি পূজা দেবার
ঈশ্বরের পূজা-বেদীমূলে।
উভয়ই আমরা বিপথে ভক্তিমার্গ থেকে ;
তুমি বহুদূরে আজর থেকে
আর আমি এব্রাহিম থেকে।[২৭]
মজনু আমাদের পড়েনি বিমর্ষ হয়ে
তার লায়লার বিরহে ঃ
প্রেমের উন্মত্ততায় হয় নি পরিপূর্ণ।
আত্মার প্রদীপ যখন হয় নির্বাপিত,
কি লাভ নভোস্পর্শী কল্পনায়?"
একদিন গংগা বললে হিমালয়কে–
তার পরিচ্ছদের ঝুলায়মান অংশ ধারণ করে–
"ওগো, আবৃত তোমার সর্বাঙ্গ তুষারে
সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে ;
বেষ্টিত তোমার কটিদেশ
নদী-মেঘলায়,
আল্লাহ করেছেন তোমায় অংশীদার
স্বর্গীয় রহস্যের,

কিন্তু বঞ্চিত করেছেন তোমার পদকে
মহিমাময় চলনভংগী থেকে।
হরণ করেছেন তিনি তোমার বিচরণ-শক্তি,
কি লাভ তোমার এই উচ্চতায়
আর রাজকীয় ঐশ্বর্যে?
জীবন জাগ্রত হয় বিরামহীন চলার গতি থেকে ;
তরংগের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব বিরাজ করে
তার গতিতে।"

যখন পর্বত শুনলে এই বিদ্রূপ
নদীর কাছ থেকে,–
সে স্ফীত হয়ে উঠলো ক্রোধে
অনল-সমুদ্রের মতো,
জওয়াব দিলো সে–
"তোমার বিস্তৃত জল-রাশি আমার দর্পণ ;
বক্ষে আমার লুক্কায়িত শতেক স্রোতস্বিনী
তোমার মতো।
মহিমায় চলনভংগী তোমার মৃত্যুরই পন্থা ;
যে কেহ পরিত্যাগ করে তার আত্মাকে
বরণ করে সে মৃত্যু।
জ্ঞান নেই তোমার আপন অবস্থার
উল্লসিত হও তুমি তোমার দুর্ভাগ্যে,
নির্বোধ তুমি।
তুমি তোমার অস্তিত্বকে দিয়েছো ডালি
মহা-সমুদ্রের পায়ে,
নিক্ষেপ করেছো তোমার বহুমূল্য মুদ্রাধার
পথদস্যুর হাতে।

আত্মসমাহিত হও গোলাবের মতো
বাগিচার মাঝে,
যেয়ো না পুষ্প-বিক্রেতার কাছে
তোমার সুরভি বিস্তার করতে।
জীবন্ত থাকার মানে আত্মবর্ধিষ্ণু হওয়া
আর জন্ম দেওয়া গোলাব-রাজিকে
তোমার আপন পুষ্প-বীথিতে।
যুগযুগান্তর গেছে অতীতের কোলে মিশে
আর আমার চরণ রয়েছে দৃঢ়বদ্ধ
মৃত্তিকার বুকে,

মনে করো তুমি, আমি বহুদূরে
আমার লক্ষ্যস্থল থেকে?
আমার সত্তা জন্মলাভ করলো আর পৌঁছে গেলো
আকাশের উচ্চতায়,
জ্যোদিষ্ক-মণ্ডল ডুবে গেলো
বিশ্রাম নিতে আমার পরিচ্ছদের তলায় ;
সত্তা তোমার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়
মহা-সমুদ্রের বুকে,
কিন্তু শিখরে আমার অবনমিত হয়
তারকা-রাজির মস্তক।
আঁখি আমার দর্শন করে স্বর্গের রহস্য
কর্ণ আমার পরিচিত
স্বর্গ-দূতের পক্ষের সাথে।

যখন থেকে আমি দীপ্ত হোলাম
অবিরাম শ্রান্তির উত্তাপে,
সঞ্চয় করলাম কতো লাল, হীরা আর মণিমাণিক্য।
ভিতরে আমার প্রস্তর,
আর প্রস্তরের মাঝে আছে অগ্নি ;
জল পারে না বয়ে যেতে
আমার অগ্নির উপর দিয়ে।
তুমি একটি জলবিন্দু?
ভেঙে যেয়ো না তোমার আপনার পদে,
চেষ্টা কর ফুলে উঠে সমুদ্রের সাথে
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে।

আকাংখা কর তুমি রত্নের প্রভা
হয়ে ওঠ রত্ন।
হয়ে ওঠ কর্ণভূষণ,
সজ্জিত কর এক সুন্দরীকে।
ওগো বিস্তৃত কর আপনাকে, দ্রুতগতিশীল হও।
হও তুমি মেঘমালা–
যে প্রকাশ করে বিদ্যুৎ-চমক
আর বৃষ্টিবাত্যা!
মহাসমুদ্র অন্বেষণ করুক তোমার ঝটিকা
ভিক্ষুকের মতো,
অভিযোগ করুক সে তার পরিচ্ছদের দৈন্য।
ভাবুক সে তার আপনাকে তরংগের চেয়ে ক্ষুদ্রতর,
আর প্রবাহিত হোক তোমার চরণতলে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

[মুসলিম জীবনের উদ্দেশ্য আল্লার বাণীকে সার্থক করা। জেহাদের মূলে যদি থাকে রাজ্যলোভ তা হোলে তা ইসলামের বিধি-বহির্ভূত।

রঞ্জিত করে তোল তোমার অন্তরকে
আল্লার রঙে,
সম্মানি ও গৌরব দান কর প্রেমকে।
মুসলিমের প্রকৃতি বিরাজমান প্রেমের ভিতরে ;
মুসলিম যদি না হয় প্রেমিক,
কাফের সে।
আল্লার উপরে নির্ভর করে তার দেখা, না-দেখা,
তার পানাহার ও নিদ্রা।
তার ইচ্ছার ভিতরে হারিয়ে যায় আল্লার ইচ্ছা,
"কি করে বিশ্বাস করবে মানুষ এই বাণী?"[২৮]
শিশির সন্নিবেশ করে সে
'লা-ইল্লাল্লাহ'র ক্ষেত্রে,
মানবের কাছে সে প্রতিভূ এই বিশ্বে।[২৯]

তার উচ্চ পদমর্যাদার সাক্ষ্য সেই মহান নবী
যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন মানব ও জ্বিনের কাছে,
প্রতিভূসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী।
পরিত্যাগ কর বাণী আর অন্বেষণ কর সেই আধ্যাত্মিক অবস্থা
বর্ষণ কর আল্লার জ্যোতি
তোমার কর্মের অন্ধকারে।
যদিও সজ্জিত তুমি রাজকীয় পরিচ্ছদে,
জীবন ধারণ কর দরবেশের মতো,
বেঁচে থাক জাগ্রতভাবে আল্লার ধ্যানে!

যা' কিছু কর তুমি,
লক্ষ্য হোক তোমার আল্লার নৈকট্যলাভ,
যেনো তাঁর গৌরব প্রকাশিত হয়
তোমা দ্বারা
শান্তি হয়ে ওঠে অশান্তি,–যদি তার উদ্দেশ্য হয় অপর কিছু ;

যুদ্ধ তখনই শ্রেয়,
যখন তার লক্ষ্য হয় আল্লাহ্।
যদি আল্লার গৌরব সপ্রকাশ না হয়
আমাদের তরবারি দ্বারা,
তখন যুদ্ধ অবমানিত করে মানবকে।

মহান শেখ মিঞা মীর ওয়ালী– [৩০]
আত্মা জ্যোতিতে যাঁর সপ্রকাশ হয়েছিলো
সকল গোপন পদার্থ,
পদযুগ ছিল তার দৃঢ়নিবদ্ধ মুহাম্মদের পথে,
তিনি ছিলেন বীণা
আবেগময়ী প্রেম-সংগীতের।
সমাধি তার সুরক্ষিত করে আমাদের নগরকে
অনিষ্ট থেকে,
বিচ্ছুরিত করে সত্যধর্মের জ্যোতি আমাদের উপরে!
স্বর্গ ঝুঁকে পড়েছিলো তাঁর চলার পথে,
শিষ্য ছিলেন তাঁর ভারত-সম্রাট।[৩১]
এই সম্রাট বপন করেছিলেন আকাংখা বীজ
তাঁর অন্তরে,
আর সংকল্প করেছিলেন দিগ্বিজয়ের।
ব্যর্থ আকাংখা অগ্নি ছিশো প্রজ্বলিত তাঁর অন্তরে,
শিখিয়েছিলেন তিনি তাঁর অসিকে জিজ্ঞেস করতে
"আরো আছে কিছু বাকী ?"

দক্ষিণ ভারতে ছিলো মহাসমর-কোলাহল,
দণ্ডায়মান ছিলো তাঁর সেনাবাহিনী সমর-ক্ষেত্রে।
গিয়েছিলেন তিনি নভোস্পর্শী সম্মানের আধার শেখের কাছে,
লাভ করতে তাঁর আশীর্বাদ,
মুসলিম আবর্তন করে বিশ্ব থেকে
আল্লার দিকে,
শক্তিশালী করে তার কর্মধারাকে প্রার্থনা দ্বারা।
সম্রাটের কথায় শেখ দিলেন না কোনো জওয়াব,
দরবেশমণ্ডলী ছিলেন শ্রবণোন্মুখ,
যতোক্ষণ না এক শিষ্য,
হস্তে এক মুদ্রা,
খুললে তার মুখ
আর ভাঙলে নিস্তব্ধতা।
বললে সে, –"গ্রহণ করুন আমার এ দীন তোহফা,

ওগো ঐশী পথভ্রষ্ট দলের পরিচালক!
ঘর্মাক্ত হয়েছিলো আমার সর্বাংগ
অর্জন করতে একটি দিরহাম।"

শেখ বললেন

"প্রদান করা উচিত এই অর্থ
আমাদের সুলতানকে,
ভিক্ষুক যিনি রাজকীয় পরিচ্ছদে।

যদিও প্রভুত্ব তাঁর চন্দ্র-সূর্য-তারকামণ্ডলীর উপরে,
তথাপি ক্ষুধার সম্রাট আমাদের সর্বাপেক্ষা নিস্ব
মানব জাতির ভিতরে।

দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ অপরের মুখের অন্নের প্রতি,
তাঁর ক্ষুধার অনল গ্রাস করেছে বিপুল বিশ্ব।

তরবারি তাঁর আনয়ন করেছে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী,
সৌধ তাঁর পতিত করেছে
বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড।

মানব-মণ্ডলীর কান্না উঠছে
তাঁর দারিদ্র্যের জন্য ;
রিক্ততা তাঁর লুণ্ঠন করছে দুর্বলকে।

শক্তি তাঁর সকলের দুশমনঃ
মানব জাতি হচ্ছে কাফেলা
আর তিনি দস্যু।

তার আত্মপ্রবঞ্চনা ও নির্বুদ্ধিতায়
দস্যুবৃত্তিকে তিনি অভিহিত করছেন
সাম্রাজ্য বলে।

তাঁর রাজকীয় সৈন্য দল আর শত্রুবাহিনী
উভয় খণ্ডিত হচ্ছে
তার বুভুক্ষার অসিতে।

ভিক্ষুকের ক্ষুধা গ্রাস করে তার আপন আত্মাকে,
কিন্তু সুলতানের ক্ষুধা ধ্বংস করে
রাজ্য আর ধর্ম।

যে কেহ গ্রহণ করবে তরবারি
অপর কিছুর জন্য
আল্লাহ ছাড়া,
তরবারি তার বিদ্ধ হবে
তার আপন বক্ষে।"

ষোড়শ অধ্যায়

[ভারতীয় মুসলিমদের জন্য উপদেশ। উপদেষ্টা মীর নাজাত নকশবন্দ যিনি বাবা সহরাই বলে সাধারণত পরিচিত।[৺]]

ওগো, তুমি জন্মলাভ করেছো মৃত্তিকা থেকে,
গোলাবের মতো,
তুমিও উদ্ভূত আত্মার জঠর থেকে।
পরিত্যাগ করো না আত্মাকে!
অবস্থান করো তার অভ্যন্তরে!
হও তুমি সলিল-বিন্দু এবং পান করো মহা-সমুদ্রকে!
আত্মার আলোকে যেমন প্রোজ্বল তুমি,
আত্মাকে করে তোল শক্তিমান,
তবেই তুমি হবে স্থায়ী।
তুমি লাভবান হও এই বাণিজ্য দ্বারা,
লাভ কর তুমি সম্পদ
রক্ষণ করে এই পণ্যদ্রব্য!
সত্তা তুমি
আর ভীত তুমি অসত্তার জন্য?
প্রিয় বন্ধু, ভ্রান্ত তোমার ধারণা
যেহেতু পরিচিত আমি জীবনের ঐক্যতানের সাথে,
বলবো তোমায় আমি জীবন-রহস্য–
নিমজ্জমান হওয়া তোমার আপনার ভিতরে
মুক্তার মতো,
তারপর জাগ্রত হওয়া
তোমার অন্তরের নির্জনতা থেকে;
অগ্নিস্ফুলিংগ সংগ্রহ করা ভস্মের ভিতর থেকে,
অগ্নিশিখায় পরিণত হয়ে ঝলসে দেওয়া
মানব-চক্ষু।।
যাও, দাহন কর চল্লিশ বছরের নিদারুণ দুঃখের গৃহ,
আবর্তন কর আপনার চতুর্দিকে!
হয়ে ওঠ ধুমায়িত বহ্নিশিখা!

জীবন কি অপরের চতুষ্পার্শে ঘুরে মরার দুঃখ থেকে
মুক্তি ছাড়া,
আর আপনার অন্তরকে পবিত্রতার মন্দির,
জ্ঞান না করে?

সঞ্চালন কর তোমার পক্ষ
আর মুক্ত হও পৃথিবীর আকর্ষণ থেকে ;
মুক্তি লাভ কর পতন থেকে বিহংগের মতো।
যতোক্ষণ তুমি না হও পক্ষী,
বুদ্ধির সাথে তুমি বাঁধবে না নীড়
গুহার উর্ধ্বে।
ওগো, আকাংখা কর যে জ্ঞান আহরণ করতে,
বলছি আমি তোমায় রুমের তাপসের বাণী-
"জ্ঞান-যদি তুমি গ্রহণ কর অন্তরে
সে হবে তোমার বন্ধু।"

জানো তুমি কি করে রুমী
দর্শনের বাণী প্রচার করেছিলেন আলেপ্পোতে?
জ্ঞানের নিদর্শনে দৃঢ়বদ্ধ,
সঞ্চালিত বুদ্ধির অন্ধকার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে,
এক মুসা অপ্রাপ্ত-জ্যোতি
প্রেমের সিনাই থেকে,
অপরিচিত প্রেম এবং প্রেমের অনুরাগের সাথে।
আর নবপ্লেটোবাদ নিয়ে,
আর গেঁথেছিলেন তত্ত্বদর্শনের বহু দীপ্তিমান মুক্তা।
সমাধান করেছিলেন তিনি ভ্রাম্যমাণদের সমস্যা,-
চিন্তার আলোকে তাঁর স্পষ্ট করেছিলো,
যা ছিলো অস্পষ্ট।
পুস্তকরাশি বিস্তৃত ছিলো তাঁর চতুষ্পার্শ্বে ও সম্মুখে,
তাদের রহস্যের কুঞ্জিকা ছিলো
তাঁর ওষ্ঠদেশে।
কামালের [৩৩] অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত শামস-ই-তাবরিজ
প্রবেশ-প্রার্থী হোলেন
জালাল উদ্দীন রুমীর বিদ্যায়তনে
আর বললেন চীৎকার করে,-
"কি এসব কোলাহল আর নিরর্থক প্রলাপ?
কি এত সব বিচার বিতর্ক

আর প্রদর্শনী?
"শান্ত হও নির্বোধ!"–বললেন মৌলভী–
"হেসোনা ঋষিদের মতবাদে।
বেরিয়ে যাও তুমি আমার বিদ্যায়তন থেকে।
এসব হচ্ছে যুক্তি আর আলোচনা ঃ
কি করবে তুমি এ দিয়ে?
আমার আলোচনা তোমার বুদ্ধির বহির্ভূত,
সমুজ্জ্বল করে তাতে অনুভূতির কাঁচকে।"
এই বাণী বর্ধিত করলে শামস-ই-তাবরিজের ক্রোধে,
আর ধুমায়িত করলে এক অগ্নিশিখা
তাঁর অন্তর থেকে।
দৃষ্টির বিদ্যুচ্ছটা তাঁর নিপতিত হোল
ভূমিপৃষ্ঠ,
নিশ্বাসের দীপ্তি তার ধূলিকণাকে পরিণত করলে
অনল-শিখায়।
আধ্যাত্মিক অগ্নি দগ্ধীভূত করলে জ্ঞানের স্তূপকে
আর গ্রাস করলে দার্শনিকের পুস্তকাগার।
মৌলবী যে ছিলো অজ্ঞ প্রেমের রহস্যে–
আর অপরিচিত প্রেমের ঐক্যতানের সাথে,–
বললেন চীৎকার করে ঃ
"কি করে তুমি প্রজ্বলিত করলে এই অগ্নি
যাতে দগ্ধীভূত করলো
দার্শনিকদের পুস্তকরাশি?"
উত্তর দিলেন শেখ,
"ওহে অবিশ্বাসী মুসলিম,
এ হচ্ছে স্বপ্ন আর উল্লাস ;
কি করবে তুমি এ দিয়ে?
অবস্থা আমার তোমার চিন্তার বহির্ভূত,
অগ্নিশিখা আমার স্পর্শমণিতত্ত্বজ্ঞের অমৃত।"
তুমি সংগ্রহ করেছো তোমার সার
দর্শনের তুষার থেকে,
তোমার চিন্তার মেঘ বর্ষণ করে না আর কিছু
শিলা ব্যতীত।
তোমার ভগ্ন প্রস্তরের মাঝে প্রজ্বলিত কর এক অগ্নি,
পোষণ কর এক অনল শিখা
তোমার মৃত্তিকার বুকে।
মুসলিমের জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে

আধ্যাত্মিক উপাদানে,
ইসলামের অর্থ–বর্জন করা
যা যাবে অতীতের কোলে মিশে।
এব্রাহীম যখন মুক্ত হোলেন
অস্তগামীর মায়া থেকে,[৩৪]
উপবিষ্ট হোলেন তিনি অনল–কুণ্ডে–
অক্ষত দেহে।[৩৫]
তুমি স্থাপন করেছো আল্লার জ্ঞানকে
তোমার পশ্চাতে
আর অপচয় করেছো তোমার ধর্ম
রুটির–খণ্ডের জন্য।
অতি ব্যস্ত তুমি অঞ্জনের সন্ধানে,
অপরিচিত তুমি তোমার আপন আঁখির
কৃষ্ণতার সাথে।
সন্ধান কর জীবন-নির্ঝর অসির মুখে,
আর স্বর্গীয় কাওসার দানবের মুখ থেকে,
ছিনিয়ে নেও কৃষ্ণ প্রস্তর
বোত খানার দরজা থেকে,
আর উন্মাদ কুকুর থেকে কস্তুরী মৃগের নাভিমূল,
কিন্তু আশা কোর না প্রেমের দীপ্তি
আজিকার জ্ঞান থেকে,
চেয়ো না সত্যের প্রকৃতি কাফেরের পিয়ালায়!

দীর্ঘকাল আমি বিচরণ করেছি এদিক-ওদিকে,
শিক্ষা করে নবীন জ্ঞানের রহস্য ;
মালীরা আমায় স্থাপন করেছে পরীক্ষার মুখে
আর করেছে আমায় পরিচিত
তাদের গোলাবের সাথে।
গোলাব-রাজি!
পুষ্পদল বরং সর্তক করে তাদের ঘ্রাণ গ্রহণ না করতে,
কাগজের গোলাবের ন্যায়,
গন্ধের মরীচিকা মাত্র।
যেদিন থেকে এই বাগিচা আর মুগ্ধ করে না আমায়,
আমি বেঁধেছি আমার নীড় স্বর্গীয় বৃক্ষ-চূড়ে।
আধুনিক জ্ঞান সর্বাপেক্ষা বড়ো অন্ধ,–
মূর্তি-পূজা, মূর্তি-বিক্রয়, মূর্তি-নির্মাণ!
প্রকৃতির বন্দীখানায় নিগড়বদ্ধ,–

সে ছাড়িয়ে যায়নি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের সীমানা।
জীবন-সেতু পার হতে গিয়ে সে হয়েছে নিপতিত,
সে চালিয়েছে ছুরিকা তার আপন গলদেশে।
অগ্নি তার শীতল পুষ্পের শিখার মতো,
অনল-শিখা তার শিলার মতো ঘনীভূত।
প্রকৃতি তার থাকে অস্পৃষ্ট
প্রেমের দীপ্তি দ্বারা,
চির-নিরত সে আনন্দহীন অনুসন্ধানে।
প্রেম হচ্ছে এক প্লেটো,
মুক্ত করতে অন্তরের ব্যাধি,[৩৬]
অস্ত্র তার দূরীভূত করে অন্তরের বিমর্ষতা।
নিখিল বিশ্ব ভক্তি-বিনত হয় প্রেমের কাছে,
প্রেম হোল মাহমুদ
যে জয় করে জ্ঞানের সোমনাথ।[৩৭]
আধুনিক বিজ্ঞানের পিয়ালায় আছে অভাব সুরা-রসের, সেই প্রাচীন
রাত্রি তার নহে মুখরিত
আবেগময় ফরইয়াদে।
তুমি ঘৃণা করেছো তোমার আপন সাইপ্রেসকে,
আর অপরের সাইপ্রেসকে করেছো উচ্চতর।
নলের মতো
তুমি শূন্য করেছো তোমার অন্তরকে
অপরের সংগীতে।
ওগো, যে ভিক্ষা করো একটি কণিকা
অপরের কৃপার ভাণ্ডার থেকে,
আকাংখা করবে তুমি আপনার সম্পদ
অপরের বিপণিতে?
মুসলিমদের মজলিসগৃহ দগ্ধ হয়
আগন্তুকের প্রদীপ দ্বারা,
মসজিদ তার দগ্ধীভূত হয় সন্ন্যাসের স্ফুলিংগে।
মৃগী যখন পলায়ন করলে
মক্কার পবিত্রভূমি থেকে,
শিকারীর তীর বিদ্ধ করলে তার পার্শ্বদেশ।[৩৮]
গোলাব-পত্র বিস্তৃত হয়েছে
তার খোশবুর ন্যায়,
ওগো, যে পলায়ন করেছো আত্মার দিক থেকে,
প্রত্যাবর্তন কর তার দিকে!

ওগো, কোরআনের জ্ঞানের স্বত্বাধিকারী,
খুঁজে লও তোমার হারানো ঐক্য পুনর্বার!
আমরা যারা ইসলামের দুর্গদ্বার-রক্ষী,
হয়েছি অবিশ্বাসী
অবহেলা করে ইসলামের রক্ষাকবচ।
প্রাচীন সাকীর পাত্র হয়েছে বিচূর্ণ,
হেজাজের সুরা-বিক্রেতা দল আজ বিচ্ছিন্ন।
কাবা পরিপূর্ণ আমাদের মূর্তিতে,
কুফর[৩৯] বিদ্রূপ করছে আমাদের ইসলামকে।
শেখ আমাদের ইসলামকে বলি দিয়েছে
মূর্তির প্রেম
আর ধরেছে জুন্নারের জপমালা।[৪০]

ঐশী পথনির্দেশকারী আমাদের হয়েছে পদপার্থী
শুভ্র-কেশের কাছে
আর পথচারী শিশুদের কাছেও হয়েছে হাস্যাস্পদ
অন্তরে তাদের অংকিত নেই ঈমানের দাগ,
আবাস সেথায় ইন্দ্রিয়পরতার মূর্তির।
প্রত্যেক দীর্ঘকেশ ব্যক্তি পরিধান করছে
দরবেশী পোশাক,
আফসোস এই সব ধর্ম-বণিকদের জন্য!
রাত্রিদিন তারা পরিভ্রমণ করছে শিষ্যপরিবেষ্টিত,
অজ্ঞ তারা ইসলামের সত্যিকার প্রয়াজন সম্বন্ধে!
আঁখি তাদের দীপ্তিহীন–
নার্গিস ফুলের মতো,
বক্ষ তাদের শূন্য আধ্যাত্মিক সম্পদে।

পীর আর সূফি,–
পূজা করছে সবাই দুনিয়াদারীর সমানভাবে ;
পবিত্র ধর্মের মহিমা হোল বিনষ্ট।
পীর আমাদের নিবদ্ধ করলে তার দৃষ্টি
বৌদ্ধ মন্দিরের প্রতি,
আর ধর্মের মুফতি বিক্রয় করলে তার ফতোয়া।
এর পরে, ওগো বন্ধু,
কি করবো আমরা?
পীর আমাদের ফিরিয়েছে তার মুখ
মদ্য-শালার দিকে।

সপ্তদশ অধ্যায়

[সময় হচ্ছে তরবারি ।]

তৃণশ্যামল হোক শাফীর[৪১] পবিত্র-ক্ষেত্র,
দ্রাক্ষা যাঁর আনন্দ পরিবেশন করেছে
সমগ্র বিশ্বে!
চিন্তাধারা তাঁর আহরণ করেছে একটি তারকা
আকাশের কোল থেকে ;
কালের নামকরণ করেছিলেন তিনি
"একখানি কর্তনকারী তরবারি ।"
কি করে বলবো আমি–
কি সেই তরবারির রহস্য?
দীপ্তিমান মুখাগ্রে তার জীবন বিরাজমান।
মালিক তার অত্যুচ্চ আশা এবং ভীতির ঊর্ধ্বে,
হস্ত তার শুভ্রতর মুসার হস্তের চেয়ে।
এক আঘাতে তার জল নির্গত হয়
পর্বত-গাত্র থেকে
আর সাগর হয়ে যায় ভূমিখণ্ড রসের অভাবে।
মুসা ধারণ করেছিলেন এই তরবারি
তাঁর হস্তে,
তাই সাধন করেছিলেন তিনি–
যা মানব-শক্তিতে অসম্ভব।
দ্বিধা বিদীর্ণ করেছিলেন তিনি লোহিত সাগরকে,
আর তার জলরাশিকে করেছিলেন
শুষ্ক মৃত্তিকার মতো,
খয়বর-বিজয়ী আলীর বাহু
বল সংগ্রহ করেছিলো এই একই তরবারি থেকে।
দর্শনীয় আকাশের আবর্তন,
লক্ষ্যযোগ্য নিত্য পরিবর্তন দিবস ও রাত্রির।[৪২]
লক্ষ্য কর,
ওগো, যারা অতীত ও ভবিষ্যতের মায়া-মুগ্ধ,
দর্শন কর আর এক বিশ্ব তোমার হৃদয় মাঝে!
তুমি বপন করেছো অন্ধকারের বীজ তোমার কর্দমে,
একটি রেখা বলে কল্পনা করেছো তুমি কালকে ;

চিন্তা তোমার সময়ের পরিমাপ করে
রাত্রি-দিবার পরিমাপের সাথে।
এই রেখাকে করে তোল মেঘলা
তোমার মিথ্যার বিজ্ঞাপন-কারী
মৃন্মূর্তির মতো।
ছিলে তুমি অমৃত,
পরিণত হয়েছো ধুলি-মুষ্টিতে ;
সত্যের বিবেকরূপে জন্ম তোমার
আর হোলে তুমি মিথ্যা!
মুসলিম তুমি?
তা হোলে ছিঁড়ে ফেল এই পরিবেষ্টন!
হও তুমি দীপবর্তিকা মুক্ত-স্বাধীনের মজলিসে!
না জেনে কালের মূল উৎস,
অজ্ঞ তুমি চিরন্তন জীবন সম্বন্ধে
আর কতোকাল তুমি থাকবে দাস
রাত্রি-দিবার?
জেনে লও রহস্য কালের
এই বাণী থেকে,–
"আমার সময় নির্ধারিত আছে আল্লার সাথে।[৪৩]
বিশ্ব-প্রকৃতি জাগ্রত হয় কালের গতি থেকে,
কালের অন্যতম রহস্য এই জীবন।
সময়ের কারণ নহে সূর্যের আবর্তন ;
কাল চিরন্তন,
কিন্তু সূর্য নহে স্থায়ী চিরদিনের জন্য।

কালই হচ্ছে আনন্দ ও দুঃখ,
উৎসব ও উপাবাস,
কালই চন্দ্রালোকে ও সূর্যালোকের রহস্য।
বিস্তৃত করেছো তুমি কালকে
ভূমির মতো
আর প্রভেদ রচনা করেছো
অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে।
পলায়ন করেছো তুমি সুরভীর মতো
তোমার আপন বাগিচা থেকে,
রচনা করেছো তোমার জিন্দানখানা
তোমার আপন হাতে।

কাল আমাদের–
যার নেই কোন আদি-অন্ত,
প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে আমাদের অন্তরের ফুল-বাগিচা থেকে।
তার মূল রহস্যের জ্ঞান
অনুপ্রাণিত করে জীবন্তকে নব-জীবনে;
সত্তা তার দীপ্ততর সূর্য-করোজ্জ্বল ঊষার চেয়ে।
জীবন হচ্ছে কালের
আর কাল জীবনের ;
"অপব্যয় কোর না সময়ের।"
এই ছিলো আদেশ মহান নবীর।

আহা,–জেগে ওঠে স্মৃতি সেই গৌরবময় দিবসের
কালের অসি যখন সম্মিলিত হয়েছিলো
আমাদের বাহুর শক্তির সাথে![৪৪]
বপন করেছিলাম আমরা ধর্মের বীজ
মানবের অন্তরে,
অবগুণ্ঠন-মুক্ত করেছিলাম সত্যের মুখ,
নখর আমাদের দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করেছিলো
এই পৃথিবীর বন্ধন,
নামাযে আমাদের সেজদা আশীষ বর্ষণ করেছে
বিশ্বের বুকে।
সত্যের সোরাহী থেকে উৎসারিত করেছিলাম আমরা
গোলাবী সুরারস,
অভিযান করেছিলাম আমরা
প্রাচীন শুড়িখানার বিরুদ্ধে।

ওগো, পাত্র ভরা যাদের প্রাচীন সুরা,
যে সুরার উষ্ণতায় দ্রবীভূত হয়ে
গেলাস পরিণত হয় জলে,
তারা গর্ব, ঔদ্ধত্য আর আত্ম-অহংকারে মেতে
বিদ্রূপ কর আমাদের রিক্ততায়?
আমাদেরও পিয়ালা গৌরবান্বিত করেছে
বিশ্ব-মজলিসকে ;
বক্ষে আমাদের পরিপূর্ণ ছিলো এক অপূর্ব তেজ।
নবযুগ জাগ্রত হয়েছে অনন্ত গৌরবে
আমাদের চরণ-ধূলি থেকে

শোণিত আমাদের জল-সিক্ত করেছে
আল্লার ফলকে,
আল্লার উপাসকরা সকলে ঋণী
আমাদের কাছে।
তকবির আমাদেরই দান বিশ্বের বুকে।[৬৫]
কর্দমে আমাদের নির্মিত হয়েছে কতো কাবা।
আল্লাহ্ কোরআন শিখিয়েছেন আমাদের দ্বারা,
বন্টন করেছেন তাঁর অনুগ্রহ
আমাদের হাতে।

যদিও রাজমুকুট আর রাজত্ব চলে গেছে
আমাদের হাত থেকে,
তবু চেয়ো না ঘৃণার দৃষ্টিতে আমাদের পানে
এই ভিক্ষুক-জনোচিত দারিদ্রে।
অপদার্থ আমরা তোমাদের দৃষ্টিতে,
অতীতের চিন্তায় নিমগ্ন, অবজ্ঞাত।
গৌরব আমাদের 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' থেকে,
রক্ষক আমরা এই বিশ্বের।
বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোলাহল থেকে মুক্ত আমরা,
শপথ গ্রহণ করেছি অদ্বিতীয়ের প্রেমের,
বিবেক আমরা লুক্কায়িত বিশ্ব-প্রভুর অন্তরে,
উত্তরাধিকারী আমরা মুসা ও হারুনের।
জ্যোতিতে আমাদের
উজ্জ্বল চন্দ্র-সূর্য,
বিদ্যুৎ-ঝলক আজো আছে লুক্কায়িত
আমাদের মেঘের বুকে।
অন্তরে আমাদের প্রতিবিম্বিত হয়
স্বর্গের প্রতিচ্ছবি ;
মুসলিমের সত্তাই আল্লার অন্যতম নিদর্শন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

—প্রার্থনা

ওগো, বিশ্ব-দেহের আত্মা-স্বরূপ,
আত্মা তুমি আমাদের
আর চির-পলাতক তুমি আমাদের কাছ থেকে।

সংগীত-ঝংকার তোল তুমি জীবন-বীণায় ;
মৃত্যুকে জীবন ঈর্ষা করে তখনই,
যখন সে মৃত্যু তোমার জন্য।
দুঃখ-ভারাক্রান্ত অন্তরে আমাদের
আর একবার এনে দাও শান্তি,
আর একবার আসন গ্রহণ কর
আমাদের বক্ষোতলে!
আর একবার দাবী কর আমাদের কাছ থেকে
নাম ও যশের কোরবানী,
শক্তিমান কর আমাদের দুর্বল প্রেমকে!
অভিযোগ করছি আমাদের দুর্ভাগ্যে,
মহার্ঘ্য তুমি আর আমরা মূল্যহীন।
রিক্তহস্ত আমাদের কাছে
আবৃত কোর না তোমার সুন্দর মুখ।
বিক্রয় কর সুলভে
সোলেমান আর বেলালের প্রেম![৩৬]
দাও আমাদেরকে বিনিদ্র চক্ষু
আর অনুতাপ-ভরা অন্তর,
আবার দাও আমাদেরকে পারদের স্বভাব!
খুলে দাও তোমার প্রকাশ্য নিদর্শন
আমাদের আঁখির সম্মুখে
যেনো আমাদের দুশমনের শির
হয়ে পড়ে অবনত!

এই আবর্জনা-স্তূপকে করে তোল
অনল চূড়া-বিশিষ্ট পর্বত,
দাহন কর আমাদের অগ্নিতে
যা কিছু নহে ঐশ্বরিক।

মুসলিম যখন ছেড়ে দিলো ঐক্য-সূত্র
তাদের হস্ত থেকে,
হয়ে পড়লো তারা শতধা বিচ্ছিন্ন।
বিক্ষিপ্ত আমরা বিশ্বের বুকে নক্ষত্ররাজির মতো ঃ
যদিও সন্তান আমরা একই পরিবারের,
অপরিচিত আমরা একে-অন্যের কাছে!
বেঁধে দাও একই গ্রন্থিতে এই বিক্ষিপ্ত পত্ররাজিকে,
পুনর্জাগ্রত করো প্রেমের নীতি!
টেনে নেও আমাদেরকে সেই প্রাচীন যুগের মতো
তোমার সেবায়,
ইচ্ছা তোমার পূর্ণ কর তাদের জীবনে
প্রেম করে যারা তোমায়!
দাও আমাদেরকে এব্রাহিমের বলিষ্ঠ ঈমান ;
জানিয়ে দাও আমাদেরকে 'লা-ইলাহা'র অর্থ,
পরিচিত কর আমাদেরকে
'ইল্লাল্লাহ'র রহস্যের সাথে!

জ্বলছি আমি অপরের জন্য
মোমের প্রদীপের ন্যায়,
শিখাও আমায় মোমের প্রদীপের কান্না।
ওগো আল্লাহ,
যে অশ্রু অন্তর-উজ্জ্বলকারী,
অনুরাগ-প্রভূত, বেদনায় উদ্ভূত, শান্তি-বিনাশক,
তাই যেনো আমি বপন করতে পারি
আমার বাগিচায়,
আর তা পরিণত হয় অনল-শিখায়,
যা ধুয়ে নেবে দাহ্যমান কাষ্ঠকে পুষ্পের পরিচ্ছদ থেকে!

অন্তর আমার বিগত গোধুলিতে নিবদ্ধ
আর আঁখি অনাগত ঊষার প্রতি ;
জনকোলাহলের মাঝে আমি নিঃসংগ—একা।
প্রত্যেকেই ভান করছে আমার বন্ধুত্বের,
কিন্তু কেউ জানলো না গোপন রহস্য
আমার অন্তরের।
ওহ কোথায় আমার সাথী এই বিপুল বিশ্বে?
আমি সিনাই-কুঞ্জ ঃ
কোথায় আমার মুসা?

বিশ্বাস-হন্তা আমি,
কতো অন্যায় করেছি আমি আমার আত্মার উপর,
পোষণ করেছি আমি এক অগ্নি-শিখা
আমার বক্ষমাঝে,
যে অগ্নিশিখা বুদ্ধিকে করেছে ভস্মীভূত,
অনল-সংযোগ করেছে বিবেকের পরিচ্ছদে,
উন্মত্তার সাথে শিখিয়েছি যে উদ্ধত যুক্তি,
জ্ঞানের অস্তিত্বকে করেছে যে অগ্নিময়।
দীপ্তি তার সিংহাসনারূঢ় করে সূর্যকে আকাশ-লোকে,
আর বিদ্যুৎ–চমক বেষ্টন করে তাকে
চিরন্তন উপাসনা দ্বারা।
আঁখি আমার মুসড়ে পড়লো কান্নায়
শিশির-বিন্দুর মতো,
যখন থেকে আমায় দেওয়া হয়েছে সেই গোপন অগ্নি শিখা।

শিখিয়েছিলাম আমি মোমের প্রদীপকে ক্রন্দন করতে
উন্মুক্তভাবে,
যখন আমি নিজকে দগ্ধভূত করেছিলাম
বিশ্বের আঁখি দ্বারা।
তারপর আমার প্রত্যেক কেশাগ্র থেকে নির্গত হোল অগ্নিশিখা,
আমার চিন্তার শিরা থেকে
পতিত হোল অনল-কণা ঃ
বুলবুল আমার আহরণ করেছিলো অগ্নি-স্ফুলিংগ,
আর সৃষ্টি করেছিলো অগ্নিময়ী গীতি।
হৃদয়হীন এ যুগের বক্ষ
মজনুন ছটফট করছে বেদনায়
কারণ লায়লার হাওদা আজ শূন্য।
মোমের প্রদীপের পক্ষে সহজ নয়
স্পন্দিত হওয়া একাকী ঃ
আহা নেই কি পতংগ আমার যোগ্য?
কতোকাল আমি প্রতীক্ষা করবো
আমার দুঃখভাগীর?
কতোকাল সন্ধান করবো
একজন বিশ্বস্ত বন্ধু?

ওগো,–মুখ যার আলোক দান করে
চন্দ্র ও তারকারাজিকে,
সংবরণ কর তোমার অগ্নি আমার আত্মা থেকে।
প্রতিগ্রহণ কর–যা দিয়েছো আমার বক্ষে,

দূর কর এই হন্তারক দীপ্তি আমার দর্পণ থেকে,
অথবা দাও আমায় এক প্রাচীন সংগী,
যে হবে আমার দর্পণ
সর্বগ্রাসী প্রেমের।
সমুদ্রের বুকে তরংগ নেচে চলে তরংগের সাথে ;
প্রত্যেকেরই আছে অংশী তার আবর্তনে।
আকাশে তারকা সম্মিলিত হয় তারকার সাথে
আর দীপ্তিমান চন্দ্র তার মস্তক স্থাপন করে
রাত্রির জানুদেশে।

প্রভাত স্পর্শ করে রাত্রির অন্ধকার ভাগ,
আজিকার গোধুলি ভর করে
কালিকার উষার গায়ে।
এক নদী হারিয়ে ফেলে তার সত্তা অপরের মাঝে,
এক ঝাপটা বাতাস মরে যায়
সুরভীর মাঝখানে।
নির্জন অরণ্যের প্রতি কোণে চলছে
অবিরাম নৃত্য,
উন্মাদ নৃত্য করে উন্মাদের সাথে।
কারণ সত্তায় তুমি অখণ্ড,
আবর্তন করেছো তুমি এই বিপুল বিশ্ব
আপনার আনন্দে।
উদ্যানের পুষ্প সমতুল আমি,
বিরাট জনতার মধ্যে আমি নিঃসংগ–একা।
ভিক্ষা করি তোমার কাছে আমি
একটি সহানুভূতিশীল বন্ধু,
পরিচিত আমার প্রকৃতির সাথে,
যে বন্ধু (ঐশী) মত্ততা ও জ্ঞানের সমৃদ্ধ,
পরিচয় নেই যার ব্যর্থতার অপচ্ছায়ার সাথে,
যেন আমি গোপন করতে পারি আমার ব্যথা-বিলাপ
তার আত্মায়
আর দেখতে পাই পুনর্বার আমার মুখ
তার অন্তরে।
মূর্তি তার আমি গড়ে তুলবো আমার আপন কর্দমে,
আমি হবো তার কাছে–
মূর্তি আর পূজারী–দুই।

তামাম শোদ্

কবি–পরিচিতি

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৯ নভেম্বর পাঞ্জাবের সীমান্তবর্তী সুবিখ্যাত সিয়ালকোট নগরে মহাকবি ইকবালের জন্ম। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শীতকালীন রাজধানী জম্মুর সহিত এ নগর সংলগ্ন। কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। কয়েক পুরুষ আগে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

ইকবাল প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন তাঁর জন্মভূমি সিয়ালকোট নগরে। তাঁর পিতা শেখ নূর মোহাম্মদ খুব বিদ্বান ব্যক্তি না হোলেও বহু বিজ্ঞ বন্ধুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। মৌলবী সৈয়দ মীর হাসান ছিলেন তাঁদের অন্যতম। পরবর্তীকালে সরকারী কর্তৃপক্ষ তাঁর পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে "শামসুল উলামা" উপাধি প্রদান করেছিলেন। সিয়ালকোট নগরের মারে কলেজে তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় অধ্যাপকের কাজ করতেন। তাঁরই কাছ থেকে ইকবাল আরবী ও ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ লাভ করেন। সিয়ালকোট থেকে ইকবাল এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৯৫ সালে ইকবাল বি-এ এম-এ ডিগ্রি লাভের জন্য লাহোরের সরকারী কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেখান থেকে অধ্যাপক টি ডবলিউ (পরবর্তীকালে স্যার টমাস) আরনোল্ডের ছাত্র হবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিলো। দর্শন শাস্ত্রের প্রতি তাঁর অত্যধিক অনুরাগ অধ্যাপক আরনোল্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো এবং সেই সময়ে তাঁদের ভেতরে যে বন্ধুত্ব সূচিত হয়েছিলো, তা' আজীবনকাল স্থায়ী হয়েছিলো।

কিছুকাল পরে ইকবাল এম-এ ডিগ্রি লাভ করে লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে আরবী ভাষায় ম্যাকলিয়ড রিডারের পদে নিযুক্ত হন। কয়েক বছর পরে তিনি সরকারী কলেজে দর্শন শাস্ত্রের লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি অসাধারণ কৃতকার্যতার সহিত কাজ করেন।

লাহোরে অধ্যাপনাকালে ইকবাল অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন। তিনি সারাদিনে একবার মাত্র আহার করতেন। রাত্রে তিনি মাত্র এক পিয়ালা চা পান করতেন। মাঝে মাঝে তিনি না খেয়েই কলেজের কায ক'রে চলতেন।

অতঃপর ১৯০৫ সালে তিনি আইন অধ্যয়নের জন্য ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে গবেষণার জন্য ইংল্যাণ্ড গমন করেন। অধ্যাপক আরনোল্ড তখন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। তাঁর পরামর্শমত ইকবাল পারস্য-দর্শন সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং এই বিষয়ে একটি রচনা লেখেন। এর ফলে তিনি মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। মিউনিকে তিনি একটি ক্ষুদ্রায়তন বাড়ীতে অবস্থান করতেন ও সেখানে থেকে জার্মান ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

১৯০৮ খ্রষ্টাব্দে ইকবাল আইন-ব্যবসায়ে আহূত হন এবং ভারতবর্ষে ফিরে এসে লাহোরে আইন-ব্যবসায়ে যোগদান করেন। তাঁর পূর্বতন কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে দর্শনশাস্ত্রের

অধ্যাপক পদ প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু কতিপয় শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর অনুরোধে তিনি আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। কিন্তু দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ অব্যাহত ছিল। আইন-ব্যবসায় তাঁর সামর্থ্য ও প্রতিভার অনুরূপ সাফল্য তাঁর জীবনে আনতে পারলো না, কিন্তু আইন-ব্যবসায়ের ব্যর্থতা তাঁর কাছে সাহিত্যের অপূর্ব সাফল্য নিয়ে দেখা দিলো।

ইকবাল-জীবনের প্রাথমিক আলোচনা ক'রে আমরা তাঁর কাব্য-প্রতিভার দিকে দৃষ্টিপাত করবো। ছাত্র জীবনের অতি প্রাথমিক অবস্থা থেকে তাঁর উর্দু কবিতা লেখার ঝোঁক দেখা গিয়েছিলো। লাহোরে আসার আগেই তিনি উর্দু ভাষায় কতকগুলি কবিতা লেখেন ও দিল্লীর খ্যাতনামা কবি মির্জা দাগের কাছে সংশোধনের জন্য পাঠান। দাগ তখন হায়দরাবাদের মরহুম নিজাম বাহাদুরের দরবারের জ্যোতিষ্মান আলোকশিখা। কয়েকবার ইকবালের কবিতা পাঠ করে তিনি লিখলেন যে, তাঁর কবিতার কোন সংশোধনের প্রয়োজন নেই। লাহোরে এসে ইকবাল এক মুশায়ারায় (সাহিত্য-সভা) কয়েকজন বিখ্যাত কবির সম্মুখে কবিতা আবৃত্তি করেন ও তার কবিতা তাদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়। কিছুকাল পরে এক উর্দু সাহিত্য মজলিসে হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করে এক কবিতা পাঠ করেন এবং তা' সভাজন দ্বারা উচ্চ সমাদৃত হয়। প্রথমে এই কবিতা সুবিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা "মাখজানে" প্রকাশিত হয়েছিলো। এই পত্রিকায় ইকবালের প্রাথমিক উর্দু রচনার বেশীর ভাগই আত্মপ্রকাশ করেছিলো। সাহিত্য-রসিক সমাজে তিনি উদীয়মান কবি বলে পরিচিত হবার পরই পাঞ্জাবের মুসলিম সমাজের ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান-'আঞ্জুমানে-হিমায়াৎ-ই-ইসলামের বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রতি বৎসর আহূত হোতে লাগলেন। তসবীর-ই-দরদ (ব্যথার ছবি), (শিকওয়া আল্লার কাছে অভিযোগ) ও জওয়াব-ই-শেকোয়ার (অভিযোগের উত্তর) মতো কবিতা আবৃত্তির ফলে উর্দু কবি হিসাবে ইকবালের খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়লো।

ইকবালের উর্দু কবিতারাজিকে নিম্নলিখিত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে,-

১. ১৯০৫ সালে ইংলণ্ড গমনের পূর্বে লেখা ;
২. ১৯০৮ সাল পর্যন্ত ইউরোপে অবস্থানকালে লেখা ; এবং
৩. ১৯০৮ সালের পর থেকে কবির ফারসী ভাষায় কবিতা রচনা শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত লেখা। এই শেষোক্ত সময়ে কবি প্রকৃতপক্ষে উর্দু রচনা থেকে কিয়ৎকালের জন্য বিরত থাকেন।

এই সকল কবিতা কবি নিজে একত্র সংগ্রহ করে ১৯২৪ সালে "বাংগেদারা" (কাফেলার ঘন্টাধ্বনি) নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। এই অস্বাভাবিক নামকরণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তাঁর সংগীত ভেঙে দিচ্ছে তাঁর দেশবাসীর যুগযুগান্তরের তন্দ্রা আর তাদের কাফেলাকে এগিয়ে নিচ্ছে অগ্রগতির পথে। এই গ্রন্থ প্রকাশ ইকবালকে উর্দু কাব্যের একচ্ছত্র অধিনায়কত্বের অধিকার দান করেছিলো। ১৯২৬ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ ও ১৯৩০ সালে তৃতীয় সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করে।

হঠাৎ একদিন ইকবাল আবিষ্কার করে ফেললেন যে, তিনি উর্দুর মতো ফারসী কবিতার মারফতেও তাঁর চিন্তার অভিনবত্ব ও কাব্যের রস-মাধুর্য্য সমানভাবেই প্রকাশ করতে

পারেন। ইংলণ্ডে একবার তাঁর বন্ধুদের দ্বারা ফারসী কবিতা লিখতে অনুরুদ্ধ হওয়ার ফলেই তিনি তাঁর অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে আবিষ্কার করে ফেললেন। পরদিন তিনি কতকগুলি সুন্দর ফারসী কবিতা লিখলেন এবং ইকবালের প্রতিভা তাঁর দর্শনধারা প্রকাশের জন্য উর্দুর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বাহন খুঁজে পেলো। ফারসী ভাষায় তাঁর প্রথম কাব্য "আস্রারে খুদী" (আত্ম-দর্শন) ১৯১৫ সালে আত্মপ্রকাশ করলো।

এই গ্রন্থ প্রকাশের ফলে ইকবালের খ্যাতি ভারতের সীমান্ত থেকে ইরান, আফগানিস্তান, তুরস্ক, রাশিয়া প্রভৃতি স্থানে, এক কথায়, যেখানে ফারসী ভাষা কথিত বা পঠিত হয়, তার সর্বত্র বিস্তার লাভ করলো। যখন ১৯২০ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর এ নিকলসন ইংরেজী ভাষায় "আস্রারে খুদী"র অনুবাদ প্রকাশ করেন, তখন তাঁর কাব্য-প্রতিভা ও দর্শনধারা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সুপরিচিত হয়ে পড়ে। এই অনুবাদের মারফতে এই গ্রন্থের কিয়দংশ জার্মান ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয় এবং এইরূপে ক্রমে কবি আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হন।

"আস্রারে খুদী"র পরে প্রকাশিত হয় ইকবালের আর একখানা ফারসী কাব্য "রমুজে বেখুদী" (আত্ম-অস্বীকারের রহস্য)। এ গ্রন্থখানিকে "আস্রারে খুদী"র পরিশিষ্ট ভাগ বলা যেতে পারে। এতে মানবত্মা বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ক্রমবর্ধিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, মানুষের জীবনের মহান লক্ষ্যে পৌছতে তাকে অনুসরণ করতে হবে শক্তি ও সাহসের আদর্শ। কবির "রমুজে বেখুদী" সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্যক্তিত্বকে অবনমিত করছে আইনের বিধানের কাছে। তাঁর মতে, মানব-জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবতার সেবা। মুসলিম হিসাবে কবি ইসলামের বিধানকে মানব-জীবনের সকল বৈষম্যের সর্বোত্তম সমাধান বলে গ্রহণ করেছিলেন্

"রমুজে বেখুদী"র পরে আত্মপ্রকাশ করে "পয়াম-ই-মাশরিক" (প্রাচ্যের সুসংবাদ)। এই ফারসী কাব্য-সংগ্রহের ছন্দ ও ভঙ্গি গ্যেটের "West Ostlicher Diwan"-এর অনুরূপ। এর পরে কবির "জবুরে আজম" ও "জাবিদনামা" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত গ্রন্থ কবির পুত্রের নামানুকরণে নামকরণ করা হয়। এর ভেতরে রয়েছে কবির অসামান্য প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন-একটি রূপক বর্ণনা এবং তাকে কবির মেরাজনামা বলা যেতে পারে। ইরানের বিখ্যাত দার্শনিক কবি জালাল উদ্দীন রুমীর আত্মার সাথে কবির আত্মার গ্রহলোক পর্যটন এতে বর্ণিত হয়েছে। রুমীর জগদ্বিখ্যাত মসনভী কাব্যের ভংগি ইকবাল তাঁর ফারসী রচনার অনুকরণ করেছেন এবং রুমীকে তিনি তাঁর আধ্যাত্ম-রাজ্যের পথ-প্রদর্শক বলে গ্রহণ করেছেন।

ইকবাল যখন তাঁর ফারসী রচনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁর উর্দু কাব্যের অনুরাগীবৃন্দ তার কাছে উর্দু কাব্য অধিকতর দানের দাবী উত্থাপন করেন। কবি তাঁদের আহবানে সাড়া দেন এবং তার ফলে তাঁর দু'খানি উর্দু কাব্য-সংগ্রহ "বালে-জিবরিল" (জিবরিলের পাখা) ১৯৩৫ সালে এবং "জরবে-কলিম" (মুসার যষ্ঠি) ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই উর্দু কবিতাবলির প্রাণবস্তু "আস্রারে খুদী" ও কবির অন্যান্য ফারসী কাব্যের অনুরূপ। কাজেই তাঁর প্রথম জীবনের উর্দু রচনার মতো সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও কবিজনসুলভ ভাব-মাধুর্যের চাইতে এতে কর্মের অনুপ্রেরণাই প্রধান বিশেষত্ব।

ইকবালের জীবদ্দশায় তাঁর সর্বশেষ পুস্তক ছিলো ফারসী ভাষায়। সুদীর্ঘ নাম-সম্বলিত ক্ষুদ্রকায় পুস্তকের নাম ছিলো-"পাছ্-চে বায়েদ কার্দ, আয় আকওয়াম-ই-শার্ক"-(কি কর্তব্য আমাদের, হে প্রাচ্য জাতি-মণ্ডলী?) এই পুস্তকে রয়েছে প্রাচ্য জাতিসমূহের উপর পাশ্চাত্য জাতিসমূহের শত্রুতামূলক আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ।

ইকবালের কাব্য-প্রতিভার নিদর্শন আর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সে হচ্ছে "আরমুগানে-হেজাজ" (হেজাজের দান)। ইকবালের রুবাই-গুচ্ছ ও বিবিধ উর্দু কবিতা-খণ্ড ১৯৩৮ সালে কবির তিরোধানের সময়ে মুদ্রণের প্রতীক্ষায় ছিলো। কবির মহা-প্রয়াণের পরে এই কাব্য প্রকাশিত হয়।

আরবের জন্য কবির অন্তরে ছিলো এক দুর্ণিবার আকর্ষণ এবং সেখানে যাবার আকাংক্ষা ছিলো তাঁর অদম্য। ভগ্নস্বাস্থ্য হেতু তার সে আশা ছিলো অপূর্ণ। হয় তো এই কাব্য তিনি সেখানে তোহফা (উপহার) স্বরূপ নিয়ে যাবার আশা পোষণ করতেন। আরো সম্ভব, তিনি পৃথিবীর কাছে হেজাজের মহাদানের অর্থ গ্রহণ করেছিলেন, কারণ এই গ্রন্থে কবি-প্রতিভার মারফতে আরবের মহা-পয়গাম্বরের প্রদত্ত মানব জীবনের অতুলনীয় শিক্ষাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

যদিও কাব্যের ভেতরেই ইকবালের খ্যাতির প্রধানতম কেন্দ্রস্থল, তথাপি তাঁর বিখ্যাত ইংরেজী গদ্য-পুস্তক "Reconstruction of Religious Thought রং Islam" একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ। মাদ্রাজের এক সাহিত্য-সমাজের আহবানে কবির প্রদত্ত ছয়টি বক্তৃতা এতে স্থান পেয়েছে। এতে কবির পাশ্চাত্য দর্শনের গভীর জ্ঞান ইসলামী ভাব-ধারার মাধুর্যের সাথে অপূর্ব সংমিশ্রণ লাভ করেছে। পাশ্চাত্য সুধিসমাজে এই গ্রন্থ যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর ইকবালের প্রতিভা পাশ্চাত্য দেশে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। এর ফলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে রোডস লেকচারার পদে নিয়োগ করতে মনস্থ করেন ও অক্সফোর্ডে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। কবি এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য হেতু তিনি সেখানে যেতে পারেন নি।

উর্দু কবিদের মধ্যে ইকবালের মত সর্বজনপ্রিয় হোতে কেউ পারেন নি। বাংলা সাহিত্যে কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই কবিদ্বয়ের পরস্পরের জন্য যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিলো। তাঁদের সাহিত্য-সাধনার কোথাও কোথাও সাদৃশ্য ও কোথাও কোথাও বৈষম্য রয়েছে। এঁরা উভয়েই এদের দেশকে ও সাধারণভাবে প্রাচ্য দেশসমূহকে ভালোবাসতেন। সমগ্র মানবজাতিকে ভালোবাসার মতো অন্তরের প্রসার তাঁদের দু'জনেরই ছিলো। দু'জনেই তাঁরা স্বাপ্নিক কবি এবং দু'জনেই স্বপ্ন দেখতেন বিশ্বের একটা সুন্দরতর ভবিষ্যতের। এই সাধারণ লক্ষ্যের দিকে তাঁদের চিন্তার গতিধারা ছিলো বিভিন্ন। যেখানে রবীন্দ্রনাথের পথ শান্তি ও সাম্যের, সেখানে ইকবালের পথ হচ্ছে সংগ্রামের। তিনি মানুষকে দিয়েছিলেন কর্মের সুসংবাদ। মিঃ আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর কথায়-তাঁর বাণী আলস্য-সুপ্ত মানুষের কর্ণে এনেছে গতি-চাঞ্চল্য, বলিষ্ঠতা ও আত্মবিশ্বাসের অমোঘ সুসংবাদ।

রবীন্দ্রনাথ এবং ইকবাল উভয়ই ভাববাদী অন্তর্দৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু একদিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য ছিলো। একজন যখন একেই তাঁর লক্ষ্যবস্তু মনে করতেন,

অপরজন তখন একে ব্যবহার করতেন একটা চলমান কর্মোন্মাদনা সৃষ্টির জন্য ও নিদ্রাকর ঔষধরূপে ভাববাদকে গ্রহণ করার কুফলের বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্কিকরণের জন্য। তাঁর মতে, প্রাচ্যদেশের বহু বিপত্তির মূল কারণ হচ্ছে আল্লার দেওয়া ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রকৃতিকে বশীভূত করে নিজের কাজে লাগাতে না পারার ভেতরে। ইকবাল-দর্শনের এই বৈশিষ্ট্যকে মিঃ ইউসুফ আলী বলেছেন, "ভাববাদের বিরুদ্ধে এক ভাববাদী প্রতিবাদ।"

জার্মান দার্শনিক নিটশের রচনার প্রভাব ইকবালের আত্মশক্তি বর্ধনের মতবাদের ভেতরে কতোখানি, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। নিটশের অতিমানুষের ধারণা ও ইকবারের আত্মদর্শনের মধ্যে নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে,- তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ইকবালের লেখার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হোলে দেখা যায় যে, তাঁর রচনার উপর নিটশের প্রভাব থাকলেও বিশ্বের কাছে তাঁর আনীত সুসংবাদের উৎসমূল রয়েছে ইসলামী ভাবধারার ভেতরে। নিটশের কোনো ধর্মের উপর বিশ্বাস ছিলো না, কিন্তু ইকবাল ধর্মকে বিশ্বাস করতেন জীবন ও শক্তির উৎসরূপে। তাঁদের উভয়ের দর্শনের মধ্যে রয়েছে এই মূলগত পার্থক্য।

হায়দরাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তার আবদুল হাকিম বলেন ঃ ইকবালের কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব আল্লার সন্ধানের আগে মানুষের সন্ধান- ইকবাল ও নিটশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের চিন্তাধারার সাথে ইসলামী সুফিবাদের ভাবধারা অপরিচিত নয়। আবদুল করিম জাবালী প্রণীত বিখ্যাত পুস্তক 'পরিপূর্ণ মানব' (The Perfect Man) রহস্যবাদের রূপে এই একই ধরনের দর্শন। মওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর বিখ্যাত মসনভী ও দিওয়ানের অনেক স্থানে এই চিন্তাধারার ছাপ রয়েছে। সর্বোপরি ক্বোরান শরীফের মতে মানুষ বিশ্বের সর্বশক্তির অধিকারী। এই খানেই এই চিন্তাধারার উৎসমূল। কালের গতিস্রোতে এ ধারণা এক প্রকার অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। ইকবালের কাব্যের মারফতে এই ধারণার বলিষ্ঠ পুনরাভিব্যক্তি মুসলিম-জীবনে এমন এক নবতর প্রেরণা এনে দিয়েছে যে, তাদের কাছে এটা জীবনের একটা নূতনতম তথ্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।" একথা নিশ্চিত সত্য যে, নিটশের সাহিত্য পাঠ ইকবালের মনের উপর গভীরভাবে ছায়াপাত করলেও ইসলামী ধর্মদর্শনের নিবিড় পরিচয় তার নিজস্ব দর্শনকে সুসংস্কৃত করে তুলেছে।

ইকবাল শুধু 'ইসলামের কবি' ছিলেন না, তিনি 'ভারতের কবি,' 'প্রাচ্যের কবি' 'মানবতার কবি-ও ছিলেন। কবি তাঁর কাব্যে ইসলামী পরিভাষা এবং মুসলিম সাহিত্যে প্রচলিত উপমাসমূহ ব্যবহার করেছেন-বিষয়ানুরূপ উপযোগিতার উপর দৃষ্টি রেখে। ইসলামের বিভিন্ন আদর্শের উপর তিনি জোর দিয়েছেন, কারণ তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, আধুনিক সভ্যতার সংকট-সমাধানের সম্ভাবনা রয়েছে এইসব আদর্শের ভেতরে।

সমসাময়িক লেখকের উপরে ইকবালের রচনাবলীর প্রভাব ছিল গভীর। প্রথমতঃ উর্দু কবি হিসাবে তাঁর প্রাধান্য অস্বীকার করার মতো গোঁড়ামী এক দল লোকের ছিলো। উর্দু সাহিত্যের লীলাভূমি যুক্তপ্রদেশে ইকবালের বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচলিত ছিলো, কারণ

ইকবালের উর্দু ছিলো সাধারণতঃ ফারসী ভাবাপন্ন ও কোনো কোনো স্থলে পাঞ্জাবী প্রভাবান্বিত। কিছুকাল পরে তাঁর খ্যাতি বিস্তার লাভ করার সাথে সাথে এই গোঁড়ামী অন্তর্নিত হয়।

ক্রমশঃ ইকবালের চিন্তার সৌন্দর্য ও তেজস্বিতাপূর্ণ বাণী সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলো। এর পর থেকেই তাঁর সমসাময়িক তরুণ লেখকরা তাঁর ছন্দ ও ভাবধারার অনুকরণ করতে লাগলো। তাঁর আত্মশক্তিতে জাগ্রত করে তুলবার মতবাদ বহুসংখ্যক লেখকের রচনায় প্রকাশ লাভ করেছে।

ধনিক ও শ্রমিকের বিরোধ সম্বন্ধে তাঁর রচনা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলো। ইকবাল কাল মার্কস-এর মতবাদ বেশ ভলোভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন ও তা দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। শ্রমিক কৃষকের দুর্ভাগ্য ও ধনিদের নিপীড়ন সম্বন্ধে তিনি বহু কবিতা লিখেছিলেন।

শুধু ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধেই তাঁর তীব্র মতবাদ প্রচারিত হয়নি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও তিনি সুতীব্র সমালোচনা চালিয়েছিলেন। কতকগুলি আপত্তিজনক জিনিসের জন্য গণতন্ত্রকেও তিনি আক্রমণ করেছিলেন। একবার এক কবিতায় তিনি বলেছিলেন, "গণতন্ত্র এমন একটি মতবাদ, যাতে মস্তিষ্ক গণনাই করা হয়, পরিমাপ করা হয় না।" আর একটি কবিতায় তিনি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুক্তির অবতারণা করেছেন কম, কিন্তু বিদ্রূপ করেছেন অনেক বেশী। তিনি বলেন-

"সতর্ক হও গণতন্ত্র সম্বন্ধে-
আর মেনে চলো পক্কবুদ্ধি মানবের নির্দেশ,
কারণ দু'শো গর্দভের মস্তিষ্ক
সৃষ্টি করতে পারে না
একটি মাত্র মনেবের জ্ঞান।

"জাতিসংঘ' বা League of Nations এর নাম দিয়েছিলেন তিনি 'শববস্ত্রাপহারী' (Stealers of shrouds) যারা গড়ে তুলেছে একটা সংহতি মৃত জাতিসমূহের সমাধি বিভাগের জন্য। ভারতীয় সংবাদ-পত্রসমূহে এর ফলে দীর্ঘকাল যাবত জাতিসংঘকে শববস্ত্রাপহারী সংঘ বলে অভিহিত করা হোত।

যদিও সাহিত্য-সেবাই ছিলো ইকবাল-জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাধনা, তথাপি কিছুকালের জন্য তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতরণ করেছিলেন। নিজের ইচ্ছায় তিনি হয় তো রাজনীতি-কণ্টকিত পথে পদক্ষেপ করতেন না। বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি লাহোরের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যপদ-প্রার্থী হয়েছিলেন। বন্ধুদের চেষ্টায় ও তাঁর জনপ্রিয়তার জন্য তিনি একরূপ বিনা চেষ্টায় সদস্য নির্বাচিত হন। এই কৃতকার্যতা অবশ্যি কোন স্থায়ী ফল প্রসব করেনি। তিন বছর পর ব্যবস্থাপক সভার সংগে তাঁর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। আরো দু'বার তাঁকে রাজনীতির সাথে সংযুক্ত হোতে হয়েছিলো।

তিনি একবার নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে নেতৃত্ব করবার জন্য আহূত হন। আর একবার ১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য হিসাবে ইংলন্ডে গমন করেন। এই দু'বারের মধ্যে মুসলিম লীগ অধিবেশনই উল্লেখযোগ্য। এই সভায় কবির প্রদত্ত অভিভাষণে তিনি হিন্দু-মুসলিম দুই মহাজাতির দুর্ভাগ্য-সূচক বিভেদের প্রতিষেধক

হিসাবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিভাগের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। তখন তাঁর প্রস্তাব মুসলিম সমাজে সমর্থন পায়নি তেমন। অবশেষে তাঁর সেই পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ভারতীয় মুসলমানদের নিজস্ব বাসভূমি পাকিস্তান।

ইকবালের অসামান্য দান ছিলো শিক্ষাক্ষেত্রে। তিনি তাঁর জীবনের আরম্ভ করেছিলেন সত্যিকার শিক্ষাব্রতী হিসাবে, কিন্তু যখন তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন এ কাজের সাথে তাঁর সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। এর মানে এ নয় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহের সমাপ্তি এখানেই। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের অধ্যক্ষ (Dean) হিসাবে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষাবিষয়ক যন্ত্রণাসমূহ শিক্ষাবিভাগ সংস্কার উদ্দেশ্যে পরলোকগত বাদশাহ নাদির খাঁ কর্তৃক আহূত তিনজন পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে ইকবাল ছিলেন অন্যতম। তাঁর সহকর্মী ছিলেন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যানেসেলর মরহুম সৈয়দ স্যার রাস মসউদ ও সৈয়দ সুলায়মান নদভী। লাহোরের মিঃ গোলাম রসুল বার-য়্যাট-ল ও আলীগড়ের অধ্যাপক হাদী হাসান যথাক্রমে ইকবাল ও স্যার রাস মসউদের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে গমন করেন। তাঁরা কাবুল গমন করে আফগানদের শিক্ষা সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। তাঁদের কাবুল থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে দুর্ভাগ্যবশতঃ শাহ্ নাদির খাঁ শত্রুহস্তে নিহত হন, সুতরাং তাঁদের পরিকল্পনা তখনই কার্যে পরিণত হয় না। কিন্তু তাঁদের পরিকল্পনা অনেকাংশে কার্যকরী হয়েছে এবং অবশিষ্টাংশ বিবেচনাধীন রয়েছে।

কাবুল গমনকালে কবি বাদশাহের জন্য এক কপি মূল্যবান কোরান শরীফ উপহার নিয়ে যান। বাদশাহকে উপহার দেবার সময়ে তিনি বলেন-"বিশ্বের রহস্য, উজ্জ্বল নিদর্শনপূর্ণ আল্লার বাণী এই পবিত্র গ্রন্থ্ আপনাকে উপহার দিচ্ছি। এই আমার সর্বস্ব। আমি ফকির।"

ইকবাল সরকারী বা বে-সরকারী ক্ষমতা দ্বারা বাস্তব শিক্ষাক্ষেত্রে যা' করেছেন, তা' দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সেবার পরিমাপ করা যায় না। শিক্ষার আদর্শের দিকে তাঁর দানের পরিমাপ করতে হবে তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়ে। আলীগড় ট্রেনিং কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, কাশ্মীর ও জম্মুরাজ্যের শিক্ষাবিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর, বোম্বের বর্তমান শিক্ষা উপদেষ্টা মিঃ কে, জি সাঈয়িদাইন প্রণীত "Iqbal's Educational Philosophy" নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের উপক্রমণিকা অধ্যায়ে তিনি বলেন,-"পৃথিবীর কাছে একটা অভূতপূর্ব সুসংবাদ বহন করে আনবার জন্য ও নূতনতর মান স্থাপিত করার জন্য এমন একটা অনন্যসাধারণ সৃষ্টি প্রতিভাশালী ভাবুকের আবির্ভাব শিক্ষাব্রতীদের কাছে একটা প্রাকৃতিক অবদান। তাঁর চিন্তাধারা যত বেশী করে তাঁর সমসাময়িকদের কল্পনা, বোধ ও উৎসাহ্ আকর্ষণ করে, তত বেশী করে তাঁর প্রভাব মানুষের কাছে একটা শিক্ষার উৎস হয়ে ওঠে।

সাহিত্য-পত্রিকাসমূহে ইকবালের জীবন ও রচনাবলী সম্বন্ধে বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী এত বেশী সমালোচনা করেছেন যে, তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কবির কাব্য সম্বন্ধে ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী একটি চমৎকার সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন। ইকবালের পরলোকগমনের কয়েকমাস পূর্বে তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে সিঙ্গাপুরের "Voice of Islam" পত্রে তার বিস্তৃত আলোচনা করেন।

তিনি বলেন:
'ইকবালের গৃহে আধুনিকতার নামগন্ধ খুব কমই আছে। বাস্তবিক পক্ষে, তাঁর সম্মুখে আহূত হবার জন্য অপেক্ষা করতে গেলে একটা ঔদাসীন্যের বিশ্রী হাওয়া মানুষকে পীড়ন করে। হুকার নল মুখ থেকে সরিয়ে রেখে অসামান্য সম্মোহনের সহিত তিনি চৌকির উপর উঁচু হয়ে মানুষকে অভ্যর্থনা করেন। সেখানে তিনি পুরোপুরি প্রাচ্য কায়দায় একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের পরিচ্ছদে অর্ধশায়িত থাকেন। তাঁর হাসি মানুষকে স্বস্তি দেয়; নিখুঁত ইংরেজীতে তিনি আধুনিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেন।'
'ইসলামের প্রতি অটল বিশ্বাস এবং শিল্পীসুলভ নৈপুণ্য তাঁর কাব্যকে দিয়েছে একটা অসামান্য শক্তি। তা' অন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং তরুণ মুসলিম জানে তার কারণ। যদিও কোথাও তাঁর কাব্যশ্রুতি কঠোর ও সর্ব-ভারতীয় অনুভূতির দিক দিয়ে খাটো হয়, তা' আমাদেরকে ভুলতে হবে, শেষ পর্যন্ত মানুষকে উদ্বুদ্ধ-সঞ্জীবিত করার শক্তি রয়েছে তাঁর গুরুগম্ভীর মনুষ্যত্বের ভেতরে।"
কবি তাঁর আদর্শের সত্যিকার সাধক ছিলেন। কারো ভয়ের বা অনুগ্রহের জন্য পরওয়া না করে নিজ বিবেক অনুযায়ী তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেছেন তিনি চিরদিন।
মহাকবি ইকবালের জীবনের শেষ কয়েক বছর স্ত্রী মৃত্যুজনিত গভীর দুঃখ ও দীর্ঘকালব্যাপী অস্বাস্থ্যের মধ্য দিয়ে কেটেছিলো। দুর্বল স্বাস্থ্যের দুস্তর বাধা থাকা সত্ত্বেও কবি তাঁর সখের সাহিত্য-সাধনা ও বন্ধু-অভ্যাগতদের সাথে আলাপ-আলোচনা অব্যাহতভাবেই চালাতেন।
স্বল্পকালের অসুস্থতার পরে তাঁর মহাপ্রয়াণের দিন এলো ১৯৩৮ সালের ২১শে এপ্রিল তারিখে। লাহোরের শাহী মসজিদের পাশে তাঁর শেষ বিরাম-ভূমি। তাঁর জানাযায় যেরূপ শোকসন্তপ্ত লোক সমাগম হয়েছিলো, তা' যে-কোনো রাজা-বাদশার কাছেও ঈর্ষার বস্তু। নানাভাবে তাঁর শোকসন্তপ্ত জাতি তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে।
মৃত্যুর আগের দিন ইকবালের জার্মান বন্ধু ব্যারন ভন ভেল্‌থিম কবির সাথে সাক্ষাত করেন। প্রথমে তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে কবির সাথে আলোচনা করেন। পরে কবির স্বাস্থ্যের অবস্থা জানতে চাইলে কবি বলেনঃ 'মৃত্যুর জন্য আমি ভীত নই। আমি মুসলিম ; মৃত্যুকে আমি সহাস্য বদনে আমন্ত্রণ করবো।'

কবির শেষ বাণী

আসবে সুরের হারানো রেশ
কিম্বা সে আর আসবে না,
হেজাজ-হাওয়া আসবে অশেষ
কিম্বা সে আর আসবে না,
সীমান্তে আজ পড়লো আসি
এই ফকীরের দিনগুলি;
আসবে নতুন সুধী এ দেশ
কিম্বা সে আর আসবে না।

অনুবাদ ঃ ফররুখ আহ্‌মদ

তথ্যসূত্র ঃ

১. 'সুরা' মানে এখানে ঐশী প্রেমের রহস্য।
২. বীচ–বৃক্ষবিশেষ।
৩. এখানে দার্শনিক কবি জালালউদ্দীন রুমীর আত্মিক গুরু শামস-ই-তাবরিজকে বুঝানো হয়েছে।
৪. নজদ–আরবের উচ্চভূমি। বহু রোমাঞ্চকর প্রেমের কাহিনী এ দেশের সংগে বিজড়িত। লায়লা-মজনুর প্রেমকাহিনী বিশ্ববাসীর কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
৫. আতিথ্য–পরায়ণ হাতেম তায়ীর কন্যা।
৬. বায়েজিদ বোস্তামী (রাঃ) তরমুজ খেতে অস্বীকার করেছিলেন, কেননা মহানবী মুহাম্মদ (দঃ) তরমুজ কোনোদিন খাননি।
৭. কোরান
৮. পানিপথের শেখ শরাফুদ্দীন। বু-আলী কলন্দর নামে তিনি সবিশেষ পরিচিত। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।
৯. প্লেটোর দর্শন দৃশ্যতঃ মুসলিম চিন্তাধারাকে অতি অল্পই প্রভাবান্বিত করেছিলো। মুসলিম পণ্ডিতেরা যখন গ্রীক দর্শন পড়তে শুরু করলেন, তখন তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হোল আরাস্তুর দিকে। তাঁরা আরাস্তুর খাঁটি রচনাগুলি হৃদয়ংগম করতে পারেন নি। তার নামে যে সব দর্শনের অনুবাদ প্রচলিত ছিলো সেগুলিকেই তাঁরা আরাস্তুর দর্শন বলে বিশ্বাস করতেন। বাস্তবিকপক্ষে, সেগুলি ছিলো প্লাটিনাস, প্রোক্লাস এবং পরবর্তী নিউ প্লেটোনিক দর্শনবাদীদের রচনা। কাজেই অদৃশ্যভাবে প্লেটোর দর্শন গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলো ইসলামী চিন্তাধারা ও আধ্যাত্মবাদকে। প্লেটোকে মুসলিম আধ্যাত্মবাদের জনক না বললে ইসলামী চিন্তাধারার একজন প্রভাবশালী অধিনায়ক বলা যেতে পারে।
১০. জল ও কর্দম-এখানে মানবদেহ বুঝায়।
১১. কথিত আছে, হযরত খেজর (আঃ) অন্ধকার ভূমিতে 'আবে-হায়াতের' সন্ধান পেয়েছিলেন।
১২. আরবী কাব্য সাধারণতঃ একটি প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু করা হয় এবং তাতে কবির প্রেমাস্পদের উল্লেখ থাকে, অনেক সময় তার নাম দেওয়া হয় সালমা। এখানে 'সালমা আরাবী' বলতে ইসলামী সাহিত্যের ও ধর্মের আদর্শ বুঝায়।
১৩. এক অজ্ঞ কুর্দ ছাত্রদের কাছে সুফিবাদ সম্বন্ধে উপদেশ চেয়েছিলো। তারা বললো যে, তাকে একটা দড়ি উপরে বেঁধে তার অপর দিকে পা' বেঁধে ঝুলতে হবে ও তাদের শেখানো কথা আবৃত্তি করতে হবে। সে বুঝলো না যে, তাকে প্রতারিত করা হয়েছে। সে তাদের কথামতো কাজ করলেন। আল্লাহ তার ঈমানকে পুরস্কৃত করলেন। তার অন্তর আলোকিত হোল। সে এমন লাভ করলো যে, বহু উচ্চ আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা করতো। সে বলতো,–"সন্ধ্যায় আমি ছিলাম কুর্দ পরদিন প্রভাতে হোলাম আরব।"
১৪. আসা–যষ্ঠি।
১৫. মুরতজা' মানে আল্লাহ যাঁর উপর খুশী–আলীর অন্যতম নাম। বু তোরাব মানে মৃত্তিকার পিতা।
১৬. আলীর একটি কেরামতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।
১৭. খয়বর হেজাজের একটি গ্রাম। খয়বর দুর্গ ৬২৮ খৃষ্টাব্দে মুসলিম বাহিনীর করতলগত

হয়। সেই যুদ্ধে আলী অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।

১৮. আবে কাওসার'–স্বর্গীয় নদ।

১৯. হযরত রসুল (দঃ) বলেছেন,–"আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী তার দুর্গ-দ্বার।"-হাদিস।

২০. স্বর্গ–মর্ত্যে আল্লার একটি জিনিস কেউ গ্রহণ করেনি। শুধু গ্রহণ করেছে এই মানুষ জাতি। তা'-হচ্ছে 'আল্লার প্রতিনিধিত্ব'–মানে আল্লার গুণরাজিকে মানব চরিত্রে সপ্রকাশ করে তোলা।

২১. দরবেশ আলী হুজিরী (রাঃ) আফগানিস্তানের গজনীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রাচীন পারস্য সুফিতত্ত্বের রচিয়তা ছিলেন। তিনি ১০৭২ অব্দে লাহোরে দেহত্যাগ করেন। 'পীর-ই-সঞ্জয়' বলতে বিশ্ববিখ্যাত দরবেশ হযরত মুইনউদ্দীন চিশতীকে বুঝায়। তিনি ১২৩৫ অব্দে আজমীর শরীফে দেহত্যাগ করেন।

২২. এখানে প্রাচীন সুফী মতকে সংশোধন করা হয়েছে যে, মৃত্যু দ্বারা সুফী চিরন্তন জীবন লাভ করে আল্লার সাথে।

২৩. মসনভি শরীফ।

২৪. হীরককে গ্রাস করলে মানবের হয় মৃত্যু।

২৫. এক্প্রকার রহস্যময় পাখী। তার নাম ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না।

২৬. 'অবিশ্বাসের উপবীতকে মূলগ্রন্থে বলা হয়েছে 'জুন্নার।'

২৭. হযরত ইব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামের পিতা আজর ছিলেন পৌত্তলিক।

২৮. মওলানা রুমী খুব সুন্দরভাবে এই ভাবটি প্রকাশ করেছেন। হযরত রসুল (দঃ) যখন বালকমাত্র, তখন একদিন তিনি মরুভূমির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ধাত্রী হালিমা তখন দুঃখে আত্মহারা হয়ে তাঁকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। তিনি তখন অদৃশ্য বাণী শুনতে পেলেন–'দুঃখ কোর না, তিনি তোমার কাছে থেকে হারিয়ে যাবেন না ; বরং সারা বিশ্ব যাবে হারিয়ে তাঁর ভিতরে।" সত্যিকার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে যায় না এই বিশ্বের বুকে, বরং বিশ্বই হারিয়ে তার ভিতরে। ইকবালের দর্শন মতে তাঁর ইচ্ছায় আল্লার ইচ্ছা যায় হারিয়ে।

২৯. সত্যিকার মুসলিমের জীবনই তার আদর্শকে প্রমাণিত করে।

৩০. একজন মুসলিম তাপস। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে লাহোরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

৩১. সুবিখ্যাত মোগল-সম্রাট শাহজাহান।

৩২. এখানে মূল গ্রন্থকার একটি কল্পিত নাম গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়।

৩৩. বাবা কামালউদ্দীন জুন্দী। শামস-ই-তাবরিজ ও রুমীর ভিতরের সম্বন্ধ জানবার জন্য Dr. R. A. Nicholson, D., LL.D., LLD. Selected Poems from the Divani Shams-i-Tabriz (Cambridge, 1891)" দ্রষ্টব্য।

৩৪. হযরত এব্রাহিম (আঃ) সূর্য, চন্দ্র ও তারকামণ্ডলীর পূজা করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন,–"আমি প্রেম করি না তাদেরকে, যারা অস্তগমন করে।" (কোরআন)

৩৫. হযরত এব্রাহিম (আঃ) নমরুদের অনল–কুণ্ডে অক্ষতদেহে বসেছিলেন।

৩৬. মসনভী শরীফে প্রেমকে বলা হয়েছে, আমাদের অহংকার ও আত্ম-প্রতারণার চিকিৎসক, আমাদের প্লেটো আর গ্যালেন।'

৩৭. গজনীর সুলতান মাহমুদ প্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করেছিলেন।

৩৮. মক্কার পবিত্র ভূমিতে শিকার করা তীর্থযাত্রীদের জন্য নিষিদ্ধ।

৩৯. কুফর–অবিশ্বাস।

৪০. জুন্নার' অগ্নিপূজকের উপবীত।

৪১. শাফী (রাঃ) মুসলমানদের বিখ্যাত চারি ইমামের অন্যতম।

৪২. কালের প্রকৃতি ও অর্থের দিকে লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে।

৪৩. মহানবী বলেছিলেন–"আমার সময় নির্ধারিত আছে আল্লার সাথে এমনভাবে যে, কোনো ফেরেশতা বা পয়গাম্বর আমার সমকক্ষ হোতে পারেন না।" তিনি নিজেকে কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ মনে করতেন না।

৪৪. যে গৌরবময় যুগে মুসলিম জাতি অভিযান করেছিলো বিশ্বকে প্রেমে দীক্ষা দিয়ে জয় করবার জন্য।

৪৫. তকবির-ধ্বনি –"আল্লাহু আকবর"–আল্লাহ্ মহত্তম।

৪৬. সোলেমান ছিলেন ফারসী আর বেলাল হাবশী। উভয়ই ক্রীতদাস ছিলেন। এরা দু'জনেই সাধনাবলে অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক সম্মান লাভ করেছিলেন 'এরা মহাপুরুষ' মুহাম্মদের (দঃ) খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন।